আরেক রকম

অষ্টম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা
১৬-২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ ১-১৫ ফাল্গুন ১৪২৬

মূল্য : ৩০ টাকা

আরেক রকম

পাক্ষিক পত্রিকা, মাসের ১লা ও ১৬ই প্রকাশিত

স্বত্বাধিকারী : সমাজ চর্চা ট্রাস্ট

সম্পাদক

শুভনীল চৌধুরী

subhanilc@gmail.com

সম্পদকীয় দপ্তর

আরেক রকম

৩৯এ/১এ বোসপুকুর রোড, কলকাতা - ৭০০ ০৪২

প্রতি সংখ্যা ৩০ টাকা

বার্ষিক সডাক ৭০০ টাকা

এককালীন ৫০০০.০০ টাকা দিয়ে ‘সমাজ চর্চা ট্রাস্ট’-এর সদস্য হলে তাঁকে *আরেক রকম*-এর স্থায়ী গ্রাহক করে নেওয়া হবে।

arekrakam@gmail.com
samajcharcha@gmail.com

স্বত্বাধিকারী

সমাজ চর্চা ট্রাস্ট

কমার্শিয়াল কমপ্লেকস (চতুর্থ তল)

৮১/২/৭ ফিয়ার্স লেন

কলকাতা ৭০০ ০১২

গ্রাহক পরিষেবা

রবিন মজুমদার

৯৪৩২২১৯৪৪৬

আরেক রকম

অষ্টম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা ১৬-২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০,
১-১৫ ফাল্গুন ১৪২৬
Vol. 8, Issue 4th, Arek Rakam RNI No. WBBEN/2013/49896

সূ ◆ চি ◆ প ◆ ত্র

সম্পাদকীয়
আম আদমির জয় ৫
একেই বলে 'অচ্ছে দিন'! ৭

সমসাময়িক
হে (নাথু)রাম! ১০
এলআইসি-র জীবন বিমা নেই ১২
রেপাবলিক ১৩

এনপিআর বয়কট কেন ও কীভাবে
প্রসেনজিৎ বসু ও শুভনীল চৌধুরী ১৫

অপ্রকাশিত রাশিয়ার জার্নাল থেকে
বিপ্লবের স্বপ্ন
অরুণ সোম ২০

অর্থনীতির নয়, ভগবানের ভরসায় ছেড়ে দেওয়া বাজেট
অভিজিৎ মুখোপাধ্যায় ২৮

এক আকাশ রোদ্দুর-শাহিনবাগ
সংযুক্তা চট্টোপাধ্যায় ৩০

অনুশাসন, শাস্তি ও বিশ্ববিদ্যালয়ে হামলা
শ্রীদীপ ৩২

শরৎ, হেমন্ত, শীত পেরিয়ে বসন্ত আসছে
শুভময় মৈত্র ৩৪

সমাজ না, নাগরিক সমাজ: গ্রামসি বিতর্ক
সায়ন ৪০

শতবর্ষে খালেদ চৌধুরী
প্রদীপ্ত দত্ত ৪২

পিনাকী মিত্র স্মরণ
সুভাষ ভট্টাচার্য ৪৭

ইগলেটারিয়ান কোয়ালিশন— একটি পিকেটিয়ান স্বপ্ন
অর্ক রাজপণ্ডিত ৪৯

চিঠির বাক্সো ৫১

পুনঃপাঠ
অভিনয় শিক্ষা
ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায় ৫২

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক: অশোক মিত্র

উপদেষ্টা: অমিয়কুমার বাগচী

সম্পাদক
শুভনীল চৌধুরী

সম্পাদকমণ্ডলী
গৌরী চট্টোপাধ্যায়
কালীকৃষ্ণ গুহ
প্রণব বিশ্বাস
ইমানুল হক
শাক্যজিৎ ভট্টাচার্য
অমিতাভ রায়

প্রচ্ছদ
নামলিপি: হিরণ মিত্র
ছবি: দেবব্রত মুখোপাধ্যায়
(প্রখ্যাত এই চিত্রশিল্পীর জন্মশতবর্ষে আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য)

পরিবেশক
বিশাল বুক সেন্টার
৪ টৌটি লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৬
ফোন: ০৩৩-৪০৬৪-৪০৯৭, ৪১০৩, ৬৩৫৩

বাংলাদেশ পরিবেশক
পাঠক সমাবেশ
শাহবাগ, ঢাকা ১০০০

আরেক রকম পত্রিকার জন্য যোগাযোগ স্থল
শিলিগুড়ি: নন্দদুলাল দেবনাথ, ৯৪৭৪৩৮৩৪৪২
বোলপুর: সোমনাথ সমাদ্দার, ৯৪৭৫৩৬৩৩৫২

ওয়েব সাইট: www.arekrakam.com

প্রতি সংখ্যা ত্রিশ টাকা

বার্ষিক সডাক সাতশো টাকা

এককালীন ৫০০০.০০ টাকা দিয়ে 'সমাজ চর্চা ট্রাস্ট'-এর সদস্য হলে *আরেক রকম* আজীবন বিনামূল্যে পাওয়া যাবে।

সমাজ চর্চা ট্রাস্ট-এর পক্ষে তৃষিতানন্দ রায় কর্তৃক ৩৯এ/১এ, বোসপুকুর রোড, কলকাতা-৭০০ ০৪২ থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক এস. পি. কমিউনিকেশনস্ প্রা. লি., ৩১বি রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

আজীবন সদস্য

অচ্যুৎ মজুমদার
অজয় মেহতা
অদিতি মেহতা
অনন্তরামন বৈদ্যনাথন
আনবিকা গঙ্গোপাধ্যায়
অনির্বাণ দাশগুপ্ত
অনীতা সেন
অঞ্জনকুমার দাস
অপূর্ব কর
অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়
অভিজিৎ সেন
অমিতকুমার রায়
অমিতাভ রায়
অমিয়কুমার বাগ্‌চী
অম্বিকেশ মহাপাত্র
অরণী রায়
অরুন্ধতী দত্ত
অলকানন্দা পটেল
অলোককুমার ভট্টাচার্য
অশোক মিত্র (প্রয়াত)
অশোকনাথ বসু
আজিজুর রহমান খান
ইমানুল হক
উজ্জ্বলা দাশগুপ্ত
উৎসা পট্টনায়ক
ঋতা মজুমদার
ঋত্বিক চট্টোপাধ্যায়
একরামুল বারি
কিংশুক দত্ত
কুমারদেব বোস
কুণাল বসু
গোপা সামন্ত
গৌতম নওলখা
চন্দ্রশেখর বসু
চারুসীতা চক্রবর্তী
জয়তী ঘোষ
জয়ন্তী সান্যাল
জর্জ রোজেন (প্রয়াত)
জিতেন্দ্র পাচাল
জ্যোতির্ময় ঘোষ (প্রয়াত)
ডলরেস চিউ
ডালিয়া ঘোষ
তরুণ সরকার
তাপস চক্রবর্তী
তাপসকুমার পাল
তাপসী দাস
তীর্থঙ্কর চট্টোপাধ্যায়
তৃষিতানন্দ রায়
ত্রিদিব ঘোষ
দিগন্তিকা পাল
দীপককুমার ঘোষ
দীপঙ্কর সেনগুপ্ত
দীপাঞ্জন গুহ
দেবব্রত ঘোষাল (প্রয়াত)
ধৃতিকান্ত লাহিড়ীচৌধুরী (প্রয়াত)
ধ্রুবনারায়ণ ঘোষ
নিদাদাভেলু কৃষ্ণাজি
নির্মলকুমার চন্দ্র (প্রয়াত)
পবিত্র সরকার
পরঞ্জয় গুহঠাকুরতা
পরিমল ভৌমিক
পানু ভট্টাচার্য
পি কে গুহঠাকুরতা
পীযূষ চক্রবর্তী
পীযুষকান্তি রায়
পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
প্রদীপ ঘোষ
প্রভাত পট্টনায়ক
ফ্রাঁস ভট্টাচার্য
বারীন রায়
বাসন্তী সাহা
বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য
বিকাশরঞ্জন পাল
বিজয়া গোস্বামী
বিপ্লব নায়েক
বিবেকানন্দ কলেজ ফর উইমেন
বিভাস সাহা
মইদুল ইসলাম
মধুসূদন চৌধুরী
মল্লিকা আকবর
মানবী মজুমদার
মালিনী ভট্টাচার্য
মিতা পোদ্দার
মিহির ভট্টাচার্য
মুকুল মুখার্জি
মীনা সেনগুপ্ত
মৃত্যুঞ্জয় মহান্তি
যশোধরা বাগচী (প্রয়াত)
রজতকান্তি সিংহচৌধুরী
রবীন্দ্রনাথ ঘোড়ুই
রমণীকান্ত সরকার
রঞ্জন গুপ্ত (প্রয়াত)
রাজশ্রী দাশগুপ্ত
রাহুল সিংহ
রীনা শর্মা
রূপক দাস
ললিতা চক্রবর্তী
শর্বরী দাশগুপ্ত
শর্মিলা চন্দ্র
শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়
শর্মিতা ঘোষ
শর্মিষ্ঠা দাশগুপ্ত
শান্তনু বসু
শিবানী রায়চৌধুরী
শ্যামল ভট্টাচার্য
শ্রীদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীপর্ণা মিত্র
শ্রীলতা ঘোষ
সব্যসাচী বাগ্‌চী
সমরাদিত্য পাল
সত্রাজিৎ দত্ত
সুকন্যা মিত্র
সুজিত পোদ্দার
সম্বুদ্ধ পোদ্দার
সুনন্দা সেন
সুভাষ ভট্টাচার্য
সুলেখা অধিকারী
সুস্মিতা গুপ্ত
সুশীল খান্না
সোমনাথ সমাদ্দার
সৌমেন রায়
হেমেন মজুমদার

আরেক রকম

সম্পাদকীয়

আম আদমির জয়

আজ থেকে ৫০ বা ৬০ বছর পরে যখন ২০২০ সালের দিল্লি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ইতিহাস লেখা হবে তখন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম হয়ত লজ্জায়, ক্রোধে, অপমানে চেতনার গভীর স্তর থেকে আমাদের দিকে প্রশ্ন ছুঁড়বে গণতান্ত্রিক দেশের একটি রাজ্যের নির্বাচনে বিপুল পরিমাণ সাম্প্রদায়িক হিংসা ছড়ানো হল কীভাবে? কোথায় ছিল দেশের সংবিধান, কোথায় ছিল আদালত, কী করছিল নির্বাচন কমিশন যখন ভারতীয় জনতা পার্টি নামক একটি মধ্যযুগীয় মানসিকতার সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল সমস্ত গণতান্ত্রিক রীতি-নীতিকে বিসর্জন দিয়ে দেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং প্রতিবাদীদের বিরুদ্ধে লাগাতার হিংস্র বক্তব্য রাখছিল? মানুষের জীবনজীবিকার সমস্যার কথা একবারও উচ্চারণ না করে একটি দল মানুষে মানুষে বিভেদ যখন ছড়াচ্ছিল তখন কী করছিল ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থা?

ইতিহাসের কাছে জবানবন্দী দেওয়ার সময় রাষ্ট্রব্যবস্থা নয়, আদালত বা নির্বাচন কমিশন নয় আমরা গর্বিত হয়ে বলতে পারব— হ্যাঁ যাদের দেশ শাসন করার কথা ছিল, যাদের আইন বলবত করার দায়িত্ব ছিল, সবাই যখন দেশের শাসকদলের সামনে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে ছিল, আমরা যারা ভারতবাসী আমরা হার মানিনি। শাসক বিজেপি যখন দাঁত-নখ বের করে হামলে পড়েছিল দিল্লির উপর জনগণ প্রহরীর কাজ করেছিল। শত বিভেদের স্লোগানের মধ্যেও তাঁরা প্ররোচিত হননি। আম আদমি পার্টিকে ৫৩.৬ শতাংশ ভোট দিয়ে এবং ৭০টি আসনের মধ্যে ৬২ আসনে জয়যুক্ত করে জনগণ বিজেপি-র রাজনীতিকে পরাজিত করেছে দিল্লি শহরে। অসংখ্য যুদ্ধের সাক্ষী মহানগর দিল্লি সাক্ষী রইল আরও একটি যুদ্ধের যেখানে হিংসার রাজনীতি পরাজিত হল উন্নয়নের রাজনীতির কাছে।

দিল্লির আপ সরকার বিগত পাঁচ বছরে অন্তত চারটি গুরুত্বপূর্ণ জনমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করেছে যার ফল তারা বিধানসভা নির্বাচনে পেয়েছে। একদিকে ব্যাপক ভর্তুকি দিয়ে দিল্লির আপামর জনগণের কাছে বিদ্যুৎ ও জলকে সস্তা করেছে আপ সরকার। দিল্লির গরিব এবং মধ্যবিত্ত মানুষ এই নীতির ফলে লাভবান হয়েছেন এবং তাঁরা দু-হাত তুলে আপকে সমর্থন করেছেন। শুধু যদি বিদ্যুৎ ও জল সস্তায় প্রদান করাই আপ সরকারের একমাত্র কর্মসূচি

হত তবে তাকে জনমুখী বললেও জনগণের মৌলিক সমস্যাগুলির সমাধানের দিকে এক দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপ বলে মেনে নেওয়া যেত না। কিন্তু শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা দিল্লির সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আপ সরকার যেই পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করেছে তার ফল সুদূরপ্রসারী হবে। দিল্লির সরকারি স্কুলের পরিকাঠামো এবং শিক্ষার মানের আমূল পরিবর্তন, মহল্লা ক্লিনিকের মাধ্যমে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের কাছে সস্তায় স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া আপ সরকারের সর্বাধিক বড়ো অবদান। ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে দিল্লি সরকার বাজেটের ২৬ শতাংশ শিক্ষায় খরচ করেছে এবং স্বাস্থ্যে ১২.৫ শতাংশ। অর্থাৎ স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা খাতে আপ সরকার বাজেটের প্রায় ৪০ শতাংশ বরাদ্দ খরচ করেছে যা আমাদের দেশের সাম্প্রতিক ইতিহাসে প্রায় অভূতপূর্ব। একদিকে যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার লাগাতার শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের উপর খরচ কমিয়ে চলেছে সেখানে দিল্লির আপ সরকারের এই নীতি প্রশংসার দাবি রাখে।

অর্থনীতির তত্ত্বের দিক থেকেও বলা যায় যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উপর সরকারি বিনিয়োগ উন্নয়নশীল দেশ থেকে উন্নত দেশে উত্তরণের এক প্রধান উপায়। শুধু তাই নয়, আমাদের দেশে বাড়তে থাকা আর্থিক বৈষম্য কমানোর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হতে পারে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের উন্নতি। একজন দরিদ্র ব্যক্তির সন্তান যদি শিক্ষা পায় তবে সে সমাজে এগিয়ে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করবে, সে যদি স্বাস্থ্য পরিষেবা লাভ করে তবে অপুষ্টিতে ভুগবে না যার ফলে তার কর্মক্ষমতা বাড়বে। সবার শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য সুনিশ্চিত করা গেলে একদিকে যেমন আর্থিক বৃদ্ধিকেও ত্বরান্বিত করা যায়, তেমনি আর্থিক বৈষম্যকেও কমানো সম্ভব। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে আপ সরকারের বিগত পাঁচ বছরের কার্যক্রম উচ্চ প্রশংসার দাবি রাখে। এই প্রশংসার দাবি আরও জোরালো হয় যদি আমরা মনে রাখি যে বিগত পাঁচ বছর ধরে লাগাতার কেন্দ্রের বিজেপি সরকার দিল্লির আপ সরকারের বিরুদ্ধে বৈমাত্রেয় আচরণ করে গেছে। আপ নেতাদের জেলবন্দী করা হয়েছে, স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিবালের বিরুদ্ধেও সরাসরি শাসনযন্ত্রকে ব্যবহার করা হয়েছে। তবু আপ যে তার সুশাসনের প্রতিশ্রুতি পালন করতে পেরেছে তার জন্য তাদের জনগণ দু-হাত তুলে ভোট দিয়েছে।

তবু কিছু কথা এই খুশির মুহূর্তে বলতেই হয়। প্রথমত, একদিক থেকে আপ প্রশংসার পাত্র কারণ তারা বিজেপির বিভেদমূলক রাজনীতির জবাবে বিজেপির ঠিক করে দেওয়া রাজনৈতিক এজেন্ডাতে হাঁটতে অস্বীকার করে তাদের উন্নয়নের মডেল নিয়ে জনগণের মধ্যে প্রচার চালায়। কিন্তু দেশের ধর্মনিরপেক্ষতা সংক্রান্ত বেশ কিছু বিষয়ে আপের ভূমিকা যথেষ্ট প্রশ্নের জন্ম দেয়। যেমন সংবিধানের ৩৭০ ধারা বিলোপ এবং জম্মু কাশ্মীরকে ভেঙে দু-টুকরো করে তার রাজ্যের মর্যাদা কেড়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে আপ সরাসরি বিজেপি সরকারকে সমর্থন করে এবং সংসদে এই পদক্ষেপের পক্ষে ভোট দেয়। অন্যদিকে তারাই আবার দিল্লির জন্য রাজ্যের পূর্ণ মর্যাদার দাবিতে লড়াই করছে। জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের মর্যাদা কেড়ে নেওয়াকে সমর্থন এবং দিল্লির জন্য পূর্ণ রাজ্যের দাবিতে লড়াই একই সঙ্গে কী করে চলতে পারে সেই প্রশ্ন এই নির্বাচনে আপ এড়িয়ে গেছে। কিন্তু সর্বদাই যে তারা তা করতে পারবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। শাহিনবাগ আন্দোলন বা জামিয়া মিলিয়ার ক্ষেত্রেও আপ নেতৃত্ব ধরি-মাছ-না-ছুঁই-পানি গোছের অবস্থান নেন। সিএএ-এনআরসি-এনপিআর-এর মাধ্যমে দেশের সংবিধানের সামনে যেখানে এক মস্ত বিপদ কড়া নাড়ছে সেখানে আপ নেতৃত্ব খুব বেশি দিন তাদের মতাদর্শহীন রাজনৈতিক অবস্থান বজায় রাখতে পারবেন না।

এখানেই আমাদের তাকাতে হবে দিল্লির জনতার ভোটদানের প্রবণতার দিকে। ২০১৯ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত লোকসভা নির্বাচনে দিল্লিতে বিজেপি ৫৬ শতাংশ ভোট পেয়ে সাতটি আসনেই জয়ী হয় যেখানে আপ তৃতীয় স্থানে চলে যায়। ২০২০ সালের বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে যে সমস্ত জনমত সমীক্ষা দিল্লিতে হয় তার থেকে অনুমান করা যায় যে দিল্লির জনগণের একটি বড়ো অংশ সিএএ-এনআরসি-এনপিআরের পক্ষে হলেও তারা বিধানসভা নির্বাচনে আপকেই ভোট দেয় কারণ আপ অসাধারণ কাজ করেছে বিগত পাঁচ বছরে। অন্যদিকে, মাত্র ৮টি আসন পেলেও বিজেপি ৩৮.৫ শতাংশ ভোট পেয়েছে যা ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের থেকে কম হলেও ২০১৫ সালের বিধানসভা নির্বাচনের থেকে ৬ শতাংশ বিন্দু বেশি। তাই দিল্লির নির্বাচন বিজেপি-কে ধাক্কা দিলেও আত্মসন্তুষ্টির কোনো স্থান ধর্মনিরপেক্ষ শিবিরের থাকা উচিত নয়। লোকসভা নির্বাচন এখনও অনেক দূরে। বিজেপি ক্রমাগত মেরুকরণের রাজনীতি করবে। সেই রাজনীতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে লড়াই করতে হলে একদিকে যেমন

জনমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে তেমনি মতাদর্শগতভাবে বিজেপির সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধে এক বিকল্প রাজনৈতিক বিকল্প হাজির করতে হবে। আপ দাবি করছে মতাদর্শহীন উন্নয়ন নির্ভর রাজনীতিই সেই আখ্যান। শুধু এই অবলম্বনের ভিত্তিতে আরএসএস-বিজেপিকে দেশে পরাস্ত করা সম্ভব কী না সেই প্রশ্নের মীমাংসা এত সহজে হবে না।

একেই বলে 'অচ্ছে দিন'!

বেকারত্বের হার— শূন্য। আর্থিক বৃদ্ধি হ্রাস— শূন্য।

প্রিয় পাঠক চমকে উঠবেন না। দেশে বেকারত্বের হার শূন্যে এসে নামেনি, আর্থিক বৃদ্ধির হারও শূন্য নয়। দেশের অর্থমন্ত্রী গত ১ ফেব্রুয়ারি তাঁর বাজেট বক্তৃতায় কতবার বেকারত্ব এবং দেশের মন্দাবস্থা কথা দুটি উল্লেখ করেছেন, তার সংখ্যাই উপরে দেওয়া হয়েছে। আমরা *আরেক রকম*-এর পাতায় বহুবার আলোচনা করেছি কীভাবে বাড়তে থাকা বেকারত্বের হার এবং কমতে থাকা আর্থিক বৃদ্ধির হার দেশের অর্থব্যবস্থার গভীর অসুখের দ্যোতক। কিন্তু নরেন্দ্র মোদী সরকারের বাজেট বক্তৃতায় কথা দুটি স্থান পর্যন্ত পেল না। মন্দা এবং বেকারত্বের সমস্যার সমাধানের কোনো দিশা এই বাজেট যে দেখাতে পারেনি তা প্রমাণ করার জন্য এইটুকু তথ্যই যথেষ্ট। মোদী সরকার অর্থব্যবস্থার সংকটকে স্বীকার পর্যন্ত করেনি, তার সমাধানের চেষ্টা তাই তার নীতি সমূহে বা বর্তমান বাজেটে নেই।

যেমন ধরুন ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে মহাত্মা গান্ধি রোজগার যোজনা বা ১০০ দিনের কাজের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার খরচ করেছিল যথাক্রমে ৬১৮১৫ কোটি টাকা এবং ৭১০০২ কোটি টাকা। ২০২০-২১ অর্থবর্ষে এই খাতে মোট বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ ৬১৫০০ কোটি টাকা যা ২০১৮-১৯ সালের তুলনাতেও কম। কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রকের ক্ষেত্রে ২০১৯-২০ সালে বাজেট বরাদ্দ ছিল ১৩০৪৮৫ কোটি টাকা আর খরচ হয়েছে মাত্র ১০১৯০৪ কোটি টাকা। অর্থাৎ বাজেট বরাদ্দের পরেও প্রায় ২৯০০০ কোটি টাকা কম খরচ করা হয়েছে। খাদ্য ভর্তুকির ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে বাজেট বরাদ্দের তুলনায় প্রায় ৭৫০০০ কোটি টাকা কম খরচ করা হয়েছে ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে। গ্রামীণ উন্নয়ন খাতে ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে যত পরিমাণ টাকা খরচ করা হয়েছিল ২০২০-২১ সালে তার থেকে কম অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে।

দেশে যখন বেকারত্ব বিগত ৪৫ বছরের রেকর্ড ভেঙে সর্বোচ্চ স্তরে গিয়ে পৌঁছিয়েছে, কৃষি ক্ষেত্রে এক ভয়াবহ সংকট চলছে, বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে ভারতের স্থান আমাদের প্রতিবেশীদের থেকেও নীচে সেখানে কর্মসংস্থান, কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন, খাদ্য ভর্তুকির মতন গুরুত্বপূর্ণ খাতে সরকার বাজেট বরাদ্দ কমাচ্ছে। সুতরাং মনে করা যেতে পারে কর্মসংস্থান বাড়ানো বা গরিব মানুষের হাতে টাকা পৌঁছে দেওয়া খুব জরুরি কাজ বলে সরকার মনে করছে না। তাদের মতে যুবক-যুবতীরা আর চাকুরি প্রার্থী নয়, সবাই নাকি কর্মসংস্থান তৈরি করছেন ব্যাবসা করে। মুশকিল হল যুক্তিটি নেহাতই খেলো। একটি অর্থব্যবসায় সবাই কর্মসংস্থান তৈরি করতে পারেন না কারণ সবাই যদি চাকরি তৈরি করে তবে প্রশ্ন উঠবে সেই চাকরিগুলি করছে কে? আর কৃষি ক্ষেত্রে বা গ্রামীণ ভারতে কোনো সংকট আছে বলেই সরকার মনে করে না। অতএব এই সমস্ত খাতে বাড়তি খরচ করার কোনো যৌক্তিকতা সরকারের কাছে নেই।

গল্পটি সরকার ভালোই ফেঁদেছিল। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না এবং গপ্পো দিয়ে মন্দাব্যবস্থাকে অস্বীকারও করা সম্ভব নয়। তাই বাজেটে প্রদত্ত তথ্যেই উঠে এসেছে মন্দাবস্থার নিদারুণ ছবি। সেই ছবি তুলে ধরতে হলে আমাদের কিছু জরুরি আলোচনা সেরে নিতে হবে।

বাজেট আসলে সরকারের আয় ও ব্যয়বরাদ্দের হিসেব, যার মধ্য দিয়ে সরকারি নীতির দিশা সম্পর্কে একটি ধারণা তৈরি করা যায়। তাই আয় ও ব্যয়ের হিসেবগুলি গুরুত্ব দিয়ে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন একটি বাজেটকে পড়তে হলে, যা আগের আলোচনায় আমরা করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু মোদী সরকারের আমলে, বিগত দুই বছর ধরে এই সমস্ত সংখ্যাগুলি তার গুরুত্ব হারিয়েছে কারণ সরকার বিভ্রান্তিমূলক তথ্য বাজেটে লাগাতার প্রকাশ করে যাচ্ছে।

একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। যে-কোনো অর্থবর্ষ মার্চ মাসের ৩১ তারিখে শেষ হয় এবং এপ্রিলের ১ তারিখ শুরু হয়। যখন ২০২০-২১ সালের বাজেট পেশ করা হচ্ছে তখন ২০১৯-২০ সালের আয় এবং ব্যয়ের হিসেবও দেওয়া হয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে বাজেট পেশ হচ্ছে ১ ফেব্রুয়ারি আর ২০১৯-২০ অর্থবর্ষ শেষ হবে ৩১ মার্চ। তার মানে ২০১৯-২০ সালে কত ব্যয় বা আয় হল তা আসলে একটি অনুমান। আগে যখন ২৮ ফেব্রুয়ারি বাজেট পেশ করা হত তখন হাতে কিছু বেশি তথ্য থাকত যার ভিত্তিতে অনুমান করা হত। কিন্তু এখন আসলে হাতে রয়েছে ডিসেম্বর ২০১৯ অবধি তথ্য। অর্থাৎ একটি ত্রৈমাসিকের তথ্য সম্পূর্ণভাবে অনুমান করতে হচ্ছে।

যেমন ২০১৯-২০ অর্থবর্ষের বাজেটে কেন্দ্রীয় সরকার মোট কর আদায়ের লক্ষমাত্রা স্থির করেছিল ১৬.৫ লক্ষ কোটি টাকা। ২০২০-২১ সালের বাজেট পেশ করার সময় সরকার বলছে যে এই কর আসলে আদায় হবে ১৫.০৪ লক্ষ কোটি টাকা। অর্থাৎ ২০১৯-২০ সালের নির্ধারিত লক্ষমাত্রার তুলনায় সরকার প্রায় ১.৪৫ লক্ষ কোটি টাকা কম কর আদায় করতে পারবে বলে নিজেরাই ঘোষণা করছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে সরকার কি আদৌ ১৫.০৪ লক্ষ কোটি টাকাও আদায় করতে পারবে?

এই প্রশ্ন ওঠার প্রধান কারণ সরকার ডিসেম্বর ২০১৯ সালের তথ্যের ভিত্তিতে এই অনুমান করছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে ডিসেম্বর ২০১৯ অবধি সরকার মোট কর আদায় করেছে ৯.০৫ লক্ষ কোটি টাকা। অর্থাৎ সংশোধিত অনুমানের ভিত্তিতে ১৫.০৪ লক্ষ কোটি টাকা যদি সরকারকে আদায় করতে হয় তবে শেষ তিন মাসে কেন্দ্রকে ৬ লক্ষ কোটি টাকার অধিক কর সংগ্রহ করতে হবে। আগের বছরগুলির তথ্য যদি আমরা দেখি তবে দেখা যাবে শেষ তিন মাসে গড়ে বার্ষিক লক্ষমাত্রার ৩০ শতাংশ কর সংগ্রহ করা হয়েছে। কিন্তু ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে সরকারকে লক্ষমাত্রার ৪০ শতাংশ কর সংগ্রহ করতে হবে শেষ ত্রৈমাসিকে যা আগে প্রায় কখনোই হয়নি। তাই বলা যায় সরকার তার সংশোধিত কর সংগ্রহের লক্ষমাত্রাও পূরণ করতে পারবে না।

সরকারের কর সংগ্রহ ঘাটতির দুটি কারণ রয়েছে। একদিকে কর্পোরেট ক্ষেত্রকে মাত্র কয়েক মাস আগেই প্রায় ১.৫ লক্ষ কোটি টাকা কর ছাড় দেওয়া হয়। সরকার ভেবেছিল এই কর ছাড় পাওয়ার ফলে বেসরকারি ক্ষেত্রে ব্যাপক বিনিয়োগ হবে এবং দেশের আর্থিক বৃদ্ধির হার বাড়বে। কিন্তু তা হয়নি। আর্থিক বৃদ্ধির হার নিম্নগামী রয়েছে। দেশে যদি আর্থিক বৃদ্ধির হার নিম্নগামী হয় তবে কর সংগ্রহ কমতে বাধ্য। তাই অর্থমন্ত্রী তাঁর বাজেট বক্তৃতায় মন্দাবস্থার কথা নিয়ে আলোচনা না করলেও তাঁর পেশ করা কর সংগ্রহের তথ্য থেকেই পরিষ্কার যে দেশের অর্থব্যবস্থায় হাঁড়ির হাল হয়েছে।

কর সংগ্রহে যদি সমস্যা থাকে তবে বাজেট ঘাটতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য খরচের উপরে কোপ পড়তে বাধ্য। মনে রাখতে হবে সরকার ২০১৯-২০ সালের জন্য যেই সংশোধিত ব্যয়ের হিসেব পেশ করেছে তা সেই ডিসেম্বর ২০১৯ অবধি পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতেই গঠিত। যদি কর সংগ্রহ আমাদের উপরোক্ত আলোচনার যুক্তিতে কমে তবে সরকারের ব্যয়ও কমবে। তা যদি হয় তবে দেশে মন্দাবস্থা আরো ঘনীভূত হবে।

আসলে সরকার দুই ধরনের বুদ্ধিহীনতার কাজ করছে। প্রথম অর্থব্যবস্থার সংকটকে অস্বীকার করা; দ্বিতীয় বাজেট ঘাটতির হারকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য খরচের রাশ টেনে ধরা। দুটি ক্ষেত্রেই দেশের আর্থিক সংকট ঘনীভূত হবে কারণ সরকারি খরচ না বাড়ালে চাহিদার যেই সংকট অর্থব্যবস্থায় রয়েছে তা কাটবে না।

অন্যদিকে সরকারকে দৈনন্দিন খরচ চালাতে হবে। সরকার বাজেটে বলছে যে ২০২০-২১ সালে বর্তমান মূল্যে আর্থিক বৃদ্ধির হার হবে মাত্র ১০ শতাংশ। ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে সরকার অনুমান করেছিল যে এই হার হবে ১২ শতাংশ আর হয়েছে মাত্র ৭.৫ শতাংশ। অন্যদিকে মন্দাবস্থা কাটার কোনো চিহ্ন নেই। এই পরিস্থিতিতে সরকারের অনুমান ভুল প্রমাণিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবর্ষে সরকার ১৬.৩৬ লক্ষ কোটি টাকা কর সংগ্রহ করার লক্ষমাত্রা স্থির করেছে। কিন্তু আর্থিক মন্দাবস্থা যদি চলতে থাকে তবে এই কর সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে যাবে। সরকারও সেই কথা বোধহয় জানে। তাই তারা বিরাষ্ট্রীয়করণের মাধ্যমে ২০২০-২১ সালে ২১০০০০ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করবে বলে স্থির করেছে, যদিও ২০১৯-২০ সালে এই খাতে মাত্র ৬৫০০০ কোটি টাকা সরকার সংগ্রহ করতে পেরেছে। ভারতীয় জীবনবিমা নিগম (এলআইসি)-র বিলগ্নীকরণ, এয়ার ইন্ডিয়া বেচে দেওয়া, বিপিসিএলের মতন লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকে বিদেশি পুঁজির হাতে তুলে দেওয়া বর্তমানে সরকারের

প্রধান লক্ষ। সরকারের জনবিরোধী নীতির স্বরূপটি এই নিরিখেই সর্বাধিক পরিষ্কার। সাধারণ মানুষ মন্দাবস্থা এবং বেকারত্বের জ্বালায় সংকটে নিমগ্ন। অথচ সরকার তার নিরাময় করা দূর, সংকটকে স্বীকার করতেও অস্বীকার করছে। অন্যদিকে, সরকার চালানোর টাকা জোগাড় করার নামে তারা দেশের মানুষের রক্ত-ঘামে তৈরি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার ব্যাপক বিলগ্নীকরণের পথে এগোচ্ছে। মন্দাবস্থা থাকলে পুঁজিপতিদের খুব বেশি ক্ষতি নেই। সেই পুঁজিপতিদের বিনিয়োগ করার জন্য উৎকোচ হিসেবে দেশের লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থাগুলি তাদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। সব-কা-সাথ, সব-কা-বিকাশ মোদী সরকারের লক্ষ নয়। তাদের এক এবং একমাত্র লক্ষ পুঁজিপতি-কা-সাথ এবং পুঁজিপতি-কা-বিকাশ। একেই বলে 'অচ্ছে দিন'।

ছবি : সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

নিবেদন

আজীবন সদস্যদের যে তালিকা ১ জানুয়ারি, ২০২০ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে কিছু নাম বাদ পড়ে যায়। এই সংখ্যায় আমরা পূর্ণ তালিকা প্রকাশ করলাম। আমাদের এই অমার্জনীয় ত্রুটি আপনারা ক্ষমা করবেন, এটুকুই আমাদের নিবেদন।

—সম্পাদক

সমসাময়িক

হে (নাথু)রাম!

১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি। দেশরক্ষার নিমিত্ত সর্বধর্মের প্রার্থনা সভায় বসার প্রারম্ভে ধর্মোন্মাদ আততায়ীর গুলিতে লুটিয়ে পড়লেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি। তাঁর যন্ত্রণাকাতর ওষ্ঠ থেকে বেরিয়ে এসেছিল একটি মাত্র শব্দবন্ধ, 'হে রাম!' ২০২০ সালের ৩০ জানুয়ারি। জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে দেশরক্ষার নিমিত্ত আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের উপর গুলি ছুঁড়ল আরেক ধর্মান্ধ আততায়ী। গোপাল শর্মা পোষাকি নাম হলেও নিজেকে যে পরিচয় দেয় 'রামভক্ত গোপাল' হিসেবে। গুলিতে আহত হলেন এক ছাত্র। গোটা ভারতবর্ষ কেঁপে উঠে গান্ধির অন্তর্বেদনা আরো একবার উচ্চারণ করল কী না, জানা নেই। তবে এই ৩০ জানুয়ারি ভারতীয় গণতন্ত্রের পক্ষে একটা নির্ণায়ক অভিমুখ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

প্রথম স্লোগান 'জয় শ্রীরাম'। পরে বন্দুক উঁচিয়ে 'এই নাও আজাদি!' দিল্লির জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে সিএএ বিরোধী মিছিলে গুলি চালানোর আগে এই স্লোগানই দিয়েছিল 'রামভক্ত গোপাল। শুধু তাই নয়, গুলি চালানোর আগে ফেসবুকে লাইভ ভিডিও করেছিল ধৃত যুবক। তার ফেসবুক পোস্টে লেখা, 'শাহিনবাগ খেল খতম।' কার্যত নীরব পুলিশের সামনেই আন্দোলনরতদের উদ্দেশে পিস্তল উঁচিয়ে শাসাতে শুরু করে গোপাল। বলে, 'আজাদি চাহিয়ে? ম্যায়ঁ দুঙ্গা আজাদি!' এরপরই 'ইয়ে লো আজাদি' বলে গুলি চালায় ওই যুবক। তার বক্তব্য অনুযায়ী, সে মূলত নিজেই চরমপন্থী ভাবনায় প্রভাবিত হয়েছিল। তদন্তকারী অফিসারদের জানায়, শেষ দুবছর থেকে সে সোশ্যাল মিডিয়ায় উত্তেজক পোস্ট পড়তে শুরু করেছিল। প্রতিদিন অনলাইনে বক্তব্য শুনত। নিজে নানা পোস্টও শেয়ার করত। গুলি চালাবার বন্দুকটি সে এক বন্ধুর কাছ থেকে কিনেছিল দশ হাজার টাকা দিয়ে। এর আগে তার গুলি চালাবার কোনোরকম অভিজ্ঞতা ছিল না বলেই জানিয়েছে ধৃত যুবক।

গোটা ন্যারোটিভের বিশ্লেষণ অসম্ভব, যদি না একে ১৯৪৮ সালের সঙ্গে মিলিয়ে পড়া হয়। নাথুরাম গডসে ছিলেন হিন্দু মহাসভার একনিষ্ঠ এক সদস্য। নাথুরাম আরএসএস-এর সক্রিয় সদস্য ছিলেন তার যথেষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণ রয়েছে। রাজনৈতিক বীক্ষা তাঁকে ভাবতে শিখিয়েছে দেশভাগ এবং দেশে হিন্দুদের দুরবস্থার জন্য দায়ী গান্ধির রাজনৈতিক আদর্শ। সে দিন নাথুরাম শুধু গান্ধিকে হত্যা করেননি। এটি ছিল দুই বিপরীত রাজনৈতিক আদর্শের মুখোমুখি সংঘাত। যার একদিকে ধর্মনিরপেক্ষ সকল সম্প্রদায়ের সমদর্শী গণতান্ত্রিক আদর্শ, অন্য দিকে হিংস্র হিন্দুত্ববাদ। কিন্তু ১৯৪৮ আর ২০২০-র মধ্যে আছে আরো ইতস্তত টুকরো টাকরা কিন্তু গভীর তাৎপর্য্যপূর্ণ ঘটনা, যেগুলো আজকের বীজ বুনতে সাহায্য করেছে। ২০১৯ সালের ৩০ জানুয়ারি। হিন্দু মহাসভার জাতীয় সেক্রেটারি শাকুন পান্ডে গান্ধির অবয়ব তৈরি করে তাতে গুলি চালিয়ে পালন করেছিলেন শহিদ দিবস। গুলি চালানোর পর কৃত্রিম ভাবে লাল রং ঢেলে দেয়ো হয়েছিল। শুরু হয়েছিল মিষ্টি বিতরণ। এই ২০১৯ সালেই, মাত্র কিছুদিন আগে, সাধ্বী প্রজ্ঞা সংসদে বসে নাথুরাম গডসেকে দেশপ্রেমিক আখ্যা দিয়েছিলেন। বিজেপি-র মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর নিজে দিল্লির নির্বাচনি প্রচারে এসে জনসভায় স্লোগান দিয়ে গেছেন 'দেশকে গদ্দারো কো/গোলি মারো শালে কো'। যে দলের মন্ত্রী এরকম খোলাখুলিভাবে হাতে অস্ত্র তুলে নিতে মানুষকে উৎসাহ দেন, সেই দলের সমর্থক যে এই কাণ্ড ঘটাবে, সেটা তাই অযোনিসম্ভূত কোনো ঘটনা নয়। ঘটনাচক্রে, অভিযুক্ত গোপাল নিজেও অনুরাগ ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ বলে শোনা যাচ্ছে। তাই এটা কোনো আশ্চর্যের ঘটনা নয় যে ২০২০ সালে এসে গোপাল যখন গুলি চালায়, হিন্দু মহাসভা থেকে পুরস্কৃত করার কথা ঘোষণা করা হয় তাকে, এবং তাকে নাথুরাম গডসের মতোই 'দেশপ্রেমিক' আখ্যা দেওয়া হয়। আর এই প্রশ্ন করেও লাভ নেই যে গডসে-বন্দনার অতীত ট্র্যাক-রেকর্ড যাঁর ঝুলিতে, ড্যামেজ কন্ট্রোল করতে যাঁকে সংসদে দাঁড়িয়ে ক্ষমা চাওয়ানো হল, যাঁকে তড়িঘড়ি প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের

উপদেষ্টা কমিটি থেকে সরিয়ে দেওয়া হল, যাঁকে প্রধানমন্ত্রী কোনো দিন মন থেকে ক্ষমা করতে পারবেন না বলে ঘোষণা রাখলেন, মালেগাঁও বিস্ফোরণ-কাণ্ডে নাম উঠে আসা ওই সাংসদের প্রতিরক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ সংসদীয় কমিটিতে জায়গা হয়েছিল কীভাবে? আর কী ভাবেই বা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীনস্ত এক ডজন পুলিশ জামিয়া মিলিয়ায় প্রকাশ্যে গুলি চালাতে দেখেও নীরব দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল?

প্রশ্নগুলো করে লাভ নেই কারণ উত্তর সকলেই জানে। যা ঘটেছে, যা ঘটে চলেছে শাহিনবাগে, জামিয়া মিলিয়া অথবা আলিগড়ে, সেগুলো সবই বিজেপি সরকারের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মদতে। জামিয়া মিলিয়াতে যখন পুলিশ ঢুকেছে, যখন গত ৩ ফেব্রুয়ারি রাতের অন্ধকারে আবার গুলি ছুঁড়ছে গৈরিক বাহিনী, অথবা জেএনইউ-তে পুলিশি মদতে ভাড়াটে গুন্ডারা যখন তাণ্ডব চালাচ্ছে, তখন এটাই বুঝে নেবার যে এই ঘটনাগুলোর একটাও কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রশাসনের সাহায্য ছাড়া সম্ভব ছিল না। ঠিক যে কারণে জেএনইউ-তে হামলাকারীরা ধরা পড়ে না, সেই একই রসায়নে শাস্তি হবে না গোপালেরও। বিজেপি চাইছে যেন তেন প্রকারে মানুষের মনে ভয় সংক্রমণ করে দিতে, যাতে প্রতিবাদ করতে গেলে মানুষ দুবার ভাবতে বাধ্য হয়। যখন সরকার ও প্রশাসন ব্যবহার করেও আন্দোলন থামানো যাচ্ছে না, সাহায্য নিতেই হয় অন্ধকারের শক্তির। ইতিধ্যেই শাহিনবাগেও হামলা চলেছে। সেখানেও গুলি চালিয়েছে এক যুবক। ধরা পড়ার পর জোর গলায় বলেছে 'এই দেশে শুধু হিন্দুদের কথা চলবে, বাকি কারো নয়'। একদিকে বিজেপি-র লাগাতার সাম্প্রদায়িক প্রচার অন্যদিকে দাঁড়িয়ে বন্দুক হাতে এই আততায়ীরা যারা গোলি মারো স্লোগানকে মাটিতে বাস্তবায়িত করেছে। এরাই হিন্দুত্বের প্রকৃত সৈনিক।

এই যে আইনবহির্ভূত ভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর আক্রমণ নামিয়ে আনা, এ কিন্তু হিন্দুত্ববাদের উজ্জ্বল ঐতিহ্য। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে হিন্দু মহাসভা ছিল ব্রিটিশদের পক্ষে। ইংরেজ শাসকের নথি থেকে জানা যায়, বিয়াল্লিশের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে গোটা দেশ যখন উত্তাল তখন তারাই ছিল একান্ত ব্রিটিশভক্ত। এমনকী, এই স্লোগানও তোলা হয় ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই না করে মুসলিম, খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে লড়াই করার শক্তি হিন্দুদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে। কারণ তারাই নাকি দেশের প্রকৃত শত্রু। বস্তুত, হিন্দুত্ববাদীরা আন্দোলনের কোনো অভিযানে অংশ নেয়নি। সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে একটিও গণ আন্দোলন সংগঠিত করেনি। উলটে প্রকৃত জাতীয় আন্দোলন এবং তার নেতাদের উপরে আক্রমণ চালাত তারা। কাজেই, আজকের বিজেপি যদি কোনো একটি নির্দিষ্ট পক্ষের উপর ধারাবাহিকভাবে দমন চালায়, সেটাই চিনে নেবার পক্ষে যথেষ্ট যে প্রকৃত দেশপ্রেমিক কারা, এবং আপনি কোন দিক বেছে নেবেন।

পুলিশ বলেছে যে জামিয়া মিলিয়ার ঘটনায় তারা এতটাই হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল যে আকস্মিকতার অভিঘাতে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নিতে পারেনি। যদিও সব খবরের কাগজেই দেখা যাচ্ছে যে পুলিশ বুকের কাছে হাত গুটিয়ে নীরব দর্শকের ভূমিকায়, এবং কারোরই শরীরী ভাষাতে অবাক হবার লক্ষণ ছিল না। তবুও যদি পুলিশের দাবি সত্যি বলেই মানতে হয়, তা হলে তো এত অকর্মণ্য পুলিশ বাহিনী পোষার জন্যই কেন্দ্রীয় সরকারকে আগে কাঠগড়ায় তোলা উচিত। কাল যদি দিল্লির বুকে আচমকা সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ ঘটে, তা হলে তখনও কি পুলিশ এরকম হকচকিয়ে চুপ করেই দাঁড়িয়ে থাকবে? নাকি পুলিশের এই কার্যরোধী বিস্ময় নির্ভর করে আক্রমণকারী কোন ধর্মের, সেই তথ্যটির উপর? আজ যদি রামভক্ত গোপালের বদলে কোনো সংখ্যালঘু এসে গুলি চালাত, এই পুলিশকেই কি অন্য রূপে আমরা দেখতাম না? সেটাই দেখা উচিত, এবং স্বাভাবিকও। যেটা অস্বাভাবিক, তা হল প্রতিটা ঘটনা, তা জেএনইউ হোক অথবা জামিয়া বা আলিগড় কি শাহিনবাগ, পুলিশের সীমাহীন অপদার্থতা, অথবা অপদার্থতার অজুহাতে বিজেপি-র হাতের পুতুল হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে যাওয়া। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ যে বন্দুকবাজ হুমকি দেওয়া শুরু করতেই পুলিশকর্মীদের সাহায্য চেয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু কয়েক মিটার দূরে দাঁড়ানো পুলিশ কোনো হেলদোল দেখায়নি। এমনকী আহত পড়ুয়া সাদাফ ফারুখকেও সাহায্য করেনি তারা। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় সাদাফ নিজেই ব্যারিকেড ডিঙোন। সম্ভবত পুলিশ তখনও বিস্ময়ের অমানিশা কাটিয়ে আলোয় ফিরতে পারেনি!

দার্শনিক টম পেইন তাঁর মানুষের অধিকার গ্রন্থে মন্তব্য করেছিলেন যে স্বাভাবিক অবস্থায় হয়তো রাষ্ট্রকে কোনোরকমে সহ্য করা যায়, কিন্তু নিকৃষ্ট অবস্থায় রাষ্ট্র অসহনীয়। তখন তার বিরুদ্ধে দ্রোহ করাই সংগত। এই অসহনীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাই প্রতিরোধ করতে নেমেছেন এ যুগের লক্ষ লক্ষ তরুণ তরুণী, গান্ধি আম্বেদকর নেহরুর আদর্শ সেকুলার গণতান্ত্রিক সংবিধান হাতে নিয়েই। আর তাদের বিরুদ্ধে হামলা নামাতে অন্ধকারের শক্তি হিসেবে বিজেপি লেলিয়ে দিচ্ছে রামভক্ত গোপালদের। এখন আর কোনো ধোঁয়াশা নেই এটা বুঝে নিতে যে ব্যরিকেডের কোন দিকে কারা আছে। দেশ বাঁচানোর পক্ষে, না কি ফ্যাসিবাদের পক্ষে, কোন দিকে আপনি থাকবেন, সে অবস্থান বেছে নেবার দায়িত্ব আপনারই।

এলআইসি-র জীবন বিমা নেই

প্রচলিত প্রবাদ '*ঘরামির ঘর ছাওয়ার খড় জোটে না।*' '*ময়রা কখনো মিষ্টি খায় না।*' '*সুরাবিক্রেতা মদ্যপান করে না।*' হয়তো এইসব প্রবাদকে মান্যতা দেওয়ার কথা ভেবেই ভারতীয় জীবন বিমা সংস্থা বা লাইফ ইনস্যুরেন্স কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া যা চলতি ভাষ্যে এলআইসি নামেই গোটা দেশে পরিচিত, সেই রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাটি কখনো নিজের জীবনের বিমা করে রাখার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেনি। সেই দুর্বলতার সুবাদে গত ১ ফেব্রুয়ারি ২০২০-২১ আর্থিক বছরের বাজেট পেশ করার সময় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্দ্বিধায় এলআইসি-র বি-রাষ্ট্রীয়করণের প্রস্তাব ঘোষণা করলেন।

১৮১৮ সালে ওরিয়েন্টাল লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হলে ভারতবর্ষে বিমা ব্যাবসার সূচনা হয়। কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থাটি মূলত এদেশের ইউরোপীয় বাসিন্দাদের জীবন বিমা করানোর লক্ষ সামনে রেখেই ব্যাবসা শুরু করেছিল। ভারতীয়রা এই সংস্থায় জীবন বিমা করালে ইউরোপীয়দের তুলনায় অনেক বেশি প্রিমিয়াম দিতে হত। সেই বৈষম্য নিরসনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বড়োভাই সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছেলে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে স্থাপন করলেন হিন্দুস্থান ইনস্যুরেন্স সোসাইটি যা প্রথম দেশীয় মালিকানাধীন বিমা কোম্পানি। ঠাকুরবাড়ির সন্তান এবং বাবা প্রথম ভারতীয় আইসিএস হলেও সংস্থাটির আইনানুগ পঞ্জীকরণের কাজে প্রায় দশ বছর সময় অতিবাহিত হয়। সরকারিভাবে না বললেও আসল কারণ ছিল অনুশীলন সমিতির কোষাধ্যক্ষ ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সংস্থাটির দূরদর্শিতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এখনকার কলকাতার অন্যতম অভিজাত এলাকা হিন্দুস্থান পার্ক এই সংস্থাই গড়ে তোলে। এবং গড়িয়াহাট অঞ্চলের একটি রাস্তার নাম সুরেন ঠাকুর রোড। হিন্দুস্থান ইনস্যুরেন্স সোসাইটির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সামনে রেখে দেশ জুড়ে বিমা কোম্পানি স্থাপন শুরু হল। এবং একই সঙ্গে শুরু হল জালিয়াতি, বিমাকারীকে প্রতারণা জাতীয় যাবতীয় দুর্নীতি।

১৯৫৫ সালে বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী ও খ্যাতনামা সাংসদ ফিরোজ গান্ধী বিমা কোম্পানির মালিকদের দুর্নীতি ও জালিয়াতির বিষয়ে সংসদে অভিযোগ করলে দেশব্যাপী শোরগোল পড়ে যায়। শুরু হয় তদন্ত, ধরপাকড়। তৎকালীন বিখ্যাত বিমাব্যবসায়ী ও টাইমস অফ ইন্ডিয়া গোষ্ঠীর প্রধান রামকৃষ্ণ ডালমিয়া ধরা পড়েন এবং কারাবন্দি হন। অনেক তর্কবিতর্কের পর সংসদে ১৯ জুন, ১৯৫৬ তারিখে পাশ হয় লাইফ ইনস্যুরেন্স অফ ইন্ডিয়া আইন ১৯৫৬। সেই আইন অনুসারে ১ সেপ্টেম্বর ১৯৫৬, প্রতিষ্ঠিত হয় লাইফ ইনস্যুরেন্স কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া বা এলআইসিআই, লোকের মুখেমুখে যা আজ এলআইসি নামে পরিচিত। সেই সময় দেশে মোট ২৪৫টি বিমা সংস্থা ব্যাবসা করত যার মধ্যে ১৬টি বিদেশি। সবগুলিকে জাতীয়করণ করে এবং তাদের এলআইসির নিয়ন্ত্রণে নিয়ে গড়ে উঠল সরকারি মালিকানার জীবনবিমা কোম্পানি।

দীর্ঘ ৬৪ বছর ধরে লাভজনক বিমা ব্যাবসা চলার সাথে সাথে দেশের মানুষের আস্থা অর্জনকারী এলআইসিকে নিয়ে এক নতুন ধরনের পরীক্ষার চেষ্টা শুরু হয়েছে। এর আগে অনেকভাবে এলআইসিকে নিংড়ে নেওয়ার পর সংসদে বাজেট পেশ করার সময় মাত্র এক লাইনের ঘোষণা। অর্থমন্ত্রী জানালেন, জীবনবিমা নিগমে (এলআইসি) কেন্দ্রের হাতে থাকা অংশীদারির (১০০ শতাংশ) একটি অংশ বিক্রি করার পথে পা বাড়াবে সরকার। এই প্রথম বাজারে আসবে রাষ্ট্রায়ত্ত জীবনবিমা সংস্থাটির শেয়ার।

দেশের বৃহত্তম জীবনবিমা সংস্থার কত শতাংশ শেয়ার বিক্রির পরিকল্পনা করছে কেন্দ্র, তা এখনও স্পষ্ট নয়। কত দিনের মধ্যে এই পদক্ষেপ করা হবে সেই বিষয়ে সরকার এখনও নীরব। সাধারণ মানুষের সঞ্চয়ের অন্তত একটি অংশ যে সংস্থার কাছে গভীর বিশ্বাস নিয়ে গচ্ছিত রাখা আছে তার শেয়ার বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়ার কথা কী ভাবে ভাবতে পারল কেন্দ্র? সংস্থার মালিকানা পুরোপুরি কেন্দ্রের হাতে থাকায় তা ডুবে যাওয়া কিংবা টাকা মার যাওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে বিমাকারী কোনোদিন ভুলেও কোনো প্রশ্ন তোলেনি। সংস্থার উপর কতটা বিশ্বাস থাকলে এমন আস্থা অর্জন করা যায়! সিএএ, এনপিআর, এনআরসি নিয়ে তৈরি হওয়া আতঙ্ক-উদ্বেগের আবহে এলআইসি-র বি-রাষ্ট্রীয়করণের প্রস্তাব মারফত নাগরিকদের মনে গেঁথে দেওয়া হল নতুন দুশ্চিন্তার উপকরণ। তাঁদের আশঙ্কা, এর পরে এলআইসি-র উপর এতদিনের ভরসা-নির্ভরতা চিড় খাবে না তো? গ্রামে-মফসসলে অনেকেই অত তলিয়ে বোঝেন না। সরকার কত শতাংশ শেয়ার বেচল, তার খুঁটিনাটি না-ই জানতে পারেন তাঁরা। সেই সুযোগে যদি বেসরকারি বিমা সংস্থার কর্মীরা তাঁদের বোঝান যে, এবার বেসরকারি হাতে যাচ্ছে এলআইসি-ও, তাতে সম্ভাব্য লগ্নিকারীরা বিভ্রান্ত হবেন না তো?

সরকারের বিচারে এলআইসি যেন এক সোনার ডিম পাড়া হাঁস। বারেবারেই এলআইসির কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হয় টাকা সরবরাহের দায়িত্ব। এলআইসিতে কারা টাকা জমা রাখেন? স্বল্প সঞ্চয় নিশ্চিন্তে গচ্ছিত রাখার সেরা আশ্রয় বলে এলআইসি

জনপ্রিয়। যাঁরা শেয়ারবাজারের ফটকাবাজি বোঝেন না বা মিউচ্যুয়াল ফান্ডের লগ্নিতে সড়গড় নন তাঁরাই এলআইসি-র গ্রাহক। অর্থাৎ এলআইসি-তে বিমা করিয়ে মোটামুটি সকলেই নিশ্চিন্ত। কিন্তু সেই সংস্থায় গচ্ছিত থাকা জনগণের টাকা ভারত সরকার এমন কিছু কাজে লাগিয়ে চলেছে যা অনেকদিন ধরেই বিমাকারীদের চিন্তার বিষয়। এলআইসি-তে গ্রাহকদের পুঁজি নিরাপদ তো?

যাঁরা সঞ্চয় সুরক্ষিত রাখতে এই সংস্থার শরণাপন্ন হন, তাঁদের ঝুঁকির মধ্যে ফেলা কি ঠিক?

ওএনজিসি-র প্রথম বিলগ্নিকরণে ক্রেতা না মেলায় বারো হাজার কোটি টাকায় বাজারে আসা ওএনজিসি-র শেয়ারের ৯৫ শতাংশ কিনতে হয় এলআইসি-কে।

কোল ইন্ডিয়ার বিলগ্নিতে এলআইসিকে দশ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে বাধ্য করা হয়।

বিশ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করে আইডিবিআই ব্যাঙ্ককে বাঁচিয়েছে এলআইসি। সরকার এই বাজেটে আবার ঘোষণা করেছে যে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক বেচে দেওয়া হবে। যদি বেচে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ারই ছিল, তবে এলআইসি-তে সঞ্চিত মানুষের টাকা খরচ করে এই ব্যাঙ্ককে কিনতে বাধ্য করা হল কেন?

আবাসন শিল্পকে বাঁচাতেও তাদের টানা হল কেন?

এলআইসি-র দেওয়া ধার শোধ না হলে গ্রাহকদের কী হবে?

সকলকে বাঁচাতে গিয়ে শেষে তাদের লাভে টান পড়বে না তো?

গ্রাহকদের প্রিমিয়াম বাবদ এলআইসি-র বছরে আয় প্রায় তিন লক্ষ কোটি টাকা। এলআইসি সরকারি ঋণপত্রে টাকা খাটায়। গত দশ বছরে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় এলআইসির লগ্নি চার গুণ বেড়েছে। গত মার্চ পর্যন্ত সরকারি নির্দেশে বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় এলআইসি প্রায় সাড়ে বাইশ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে বাধ্য হয়েছে। বেসরকারি ক্ষেত্রেও চার লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে।

মার্চ ২০১৯-এর হিসেবে এলআইসি-র মূলধনের পরিমাণ ৩ কোটি ১১ লক্ষ ১২০০ কোটি টাকা। ২৯ কোটি বিমাকারীর দায়দায়িত্ব সামলাতে কর্মরত রয়েছেন ১ লক্ষ ১২ হাজার কর্মী। এ ছাড়া এলআইসির ব্যাবসা সম্প্রসারণের জন্য নিযুক্ত আছেন প্রায় ১১ লক্ষ এজেন্ট। নতুন বিমা করাতে পারলে তাঁরা আকর্ষণীয় কমিশন পেয়ে থাকেন। সারা দেশে ছড়িয়ে আছে এলআইসির দপ্তর। সাধারণ মানুষের আস্থা-ভরসা এবং বহু মানুষের রুজি-রোজগারে প্রশ্ন তুলে দিল দীর্ঘ বাজেট ভাষণের একটি সাদামাটা বাক্য, 'জীবনবিমা নিগমে (এলআইসি) কেন্দ্রের হাতে থাকা অংশীদারির (১০০ শতাংশ) একটি অংশ বিক্রি করার পথে পা বাড়াবে সরকার।'

এলআইসি-র স্লোগান, 'যোগক্ষেমং বহাম্যহম' ভগবত গীতার নবম অধ্যায়ের ২২তম শ্লোক থেকে উদ্ধৃত করে নেওয়া হয়েছিল যার অর্থ 'তোমার মঙ্গল আমাদের দায়িত্ব।' হিন্দুত্বের ধ্বজাধারী সরকার বি-রাষ্ট্রীয়করণের কাজে এতই ব্যস্ত যে হিন্দু ধর্মগ্রন্থ গীতাকে এড়িয়ে যেতেও আপত্তি নেই।

অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে বেসরকারি বিমা সংস্থার বাড়বাড়ন্ত দেশে আর্থিক সংকটের সম্ভাবনা বাড়ায়। ২০০৮ সালের বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকট যার প্রমাণ। ভারতে সেই সংকট খুব বেশি দাঁত ফোটাতে পারেনি কারণ আমাদের ব্যাঙ্ক শিল্পে এবং বিমা শিল্পে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার অনুপাত অনেক বেশি। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা অহেতুক ঝুঁকি নেয় না, যার পরিণামে দেশের আর্থিক ব্যবস্থায় ভারসাম্য বজায় রাখা যায়। চিনের দিকে তাকালে একথা আরো পরিষ্কার হবে। কিন্তু আমাদের দেশের সরকার ব্যাঙ্ক এবং বিমা শিল্পে ব্যাপক বেসরকারিকরণ করতে প্রবল আগ্রহী যা দেশের অর্থব্যবস্থাকে দুর্বল করবে। সাধারণ মানুষের স্বার্থ তথা দেশের অর্থব্যবস্থাকে জলাঞ্জলি দেওয়ার নীতিসমূহ আর কতদিন এমনভাবে চলবে?

রেপাবলিক

দিল্লি হয়ে উঠেছে পৃথিবীর ধর্ষণ রাজধানী। নরেন্দ্র মোদি ২০১২ খ্রিস্টাব্দে দিল্লিতে নির্ভয়া ঘটনার প্রেক্ষাপটে মন্তব্য করেছিলেন। আজ গোটা ভারত তাই হয়ে উঠেছে। কার্যত, রিপাবলিক এখন *রেপাবলিক*। জাতীয় ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো (এনসিআরবি)-র তথ্য অনুযায়ী নির্ভয়া কাণ্ডের সময়ে দেশে ধর্ষণের ঘটনার অভিযোগ এসেছিল ২৪৯২৩টি। এক্ষেত্রে ৯৮ শতাংশ ক্ষেত্রে অপরাধী ছিল ধর্ষিতার পরিচিত। ২০১৫ সালে বিজেপি শাসিত মধ্যপ্রদেশ ছিল ধর্ষণে প্রথম। জয়পুর ছিল এক্ষেত্রে প্রথম দিল্লি দ্বিতীয়। এখন উত্তরপ্রদেশ দেশের শীর্ষে।

উত্তরপ্রদেশে উন্নাও জেলায় প্রায় দিন ধর্ষণের অভিযোগ উঠছে। বিজেপির বিধায়ক কুলদীপ সেঙ্গার-এর বিরুদ্ধে ২০১৭-তে ধর্ষণের অভিযোগ জানান এক নাবালিকা। এর প্রতিকার তো হয়ই না। উলটে মেয়েটির বাবাকে থানায় ধরে নিয়ে গিয়ে নৃশংসভাবে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়। কাকাকে

নিয়ে যাওয়া হয় জেলে। মেয়েটি মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে গায়ে আগুন দিতে গেলে প্রচারমাধ্যম খবর করে। কুলদীপ গ্রেপ্তার হন। তারপর ২০১৯-এর জুলাইয়ে মেয়েটিকে ট্রাক চাপা দিয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা হয়। মেয়েটির কাকা জেলে। কাকিমা যাচ্ছিলেন ভাইঝি ও উকিলকে নিয়ে স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে। কাকিমা ঘটনাস্থলে মৃত। উন্নাওয়ের মেয়েটি ও উকিল কেমন আছেন— প্রচারমাধ্যম আজ নীরব।

২৮ নভেম্বর ২০১৯ হায়দ্রাবাদের এক উড়ালপুলের নীচে খুঁজে পাওয়া যায় এক তরুণী প্রাণীচিকিৎসকের দেহ। তাঁকে ধর্ষণ করে পুড়িয়ে মেরেছিল ৫ জন পরিবহণকর্মী। সারা দেশ উত্তাল হয়ে ওঠে। মেরে ফেলো।

পাঁচজনকেই এনকাউন্টারের নামে গুলি করে মেরে ফেলে হায়দ্রাবাদ পুলিশ। ওইদিন গুজরাটে দু-জন নাবালিকাকে ধর্ষণ করে মেরে ফেলা হয়। গোটাদেশে ওইদিন ধর্ষণের ঘটনা ঘটে ১২টি। অন্য জায়গা নিয়ে চুপ থাকে এনকাউন্টার চাওয়া জনতা।

একজন ছাত্রী ৪৯টি ভিডিও নিয়ে আদালতে হাজির হয় এক প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বিরুদ্ধে। ওই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বিজেপির এবং এক স্বামীজি বা সাধু বলে পরিচিত। তাঁর বিরুদ্ধে ছাত্রীটির অভিযোগ তাঁকে ও অন্যদের ছাত্রীনিবাস থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হত ধর্ষণের জন্য। ম্যাসাজ করতে হত নগ্ন হয়ে। রাজি না হলেই মার। উত্তরপ্রদেশের যোগী ভোগীর পুলিশ অভিযোগ নিতেই রাজি হয়নি। আদালতে গিয়ে বিচার কিছুটা মেলে। চিন্ময়ানন্দ জেলে যান। এর কিছুদিন পরে মেয়েটি ও তাঁর বাবা ও বন্ধুদের গ্রেপ্তার করা হয় মিথ্যা তোলাবাজির অভিযোগে। মেয়েটিকে পরিষেবা দিতে পর্যন্ত রাজি হয়নি পুলিশ।

৩ ফেব্রুয়ারি চিন্ময়ানন্দ জামিন পেয়ে গেলেন। ধর্ষণকারী জেলের বাইরে। ধর্ষিতা জেলে পচছেন। আসলে বিজেপি দল ধর্ষণে বিশ্বাসী। উত্তরপ্রদেশের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী অজয় কুমার বিষ্ট ওরফে যোগী আদিত্যনাথের সভা থেকে মুসলিম মহিলাদের কবর থেকে তুলে ধর্ষণের নিদান দেওয়া হয়। গুজরাট এখন ধর্ষণে দেশের সেরা। প্রতি ঘন্টায় প্রায় ৪ জন ধর্ষিতা। দিনে ৯১টি ধর্ষণ হচ্ছে দেশে। উত্তরপ্রদেশের উন্নাওয়ে তো প্রতিদিন গায়ে আগুন লাগানো একজন মেয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন উত্তরপ্রদেশের অবস্থা। জামিনে মুক্ত অপরাধীরা গায়ে আগুন লাগিয়েছে মেয়েটির।

চিন্ময়ানন্দ জামিন পেয়ে হুমকি দিচ্ছেন অভিযোগকারিণীর সাক্ষীদাতাদের। পরিবার পরিজনদের।

এখন চিন্ময় আনন্দের সময়। মৃৎ ময় জীবনে। পশ্চিমবঙ্গেও দুঃখজনকভাবে ধর্ষণের ঘটনা বাড়ছে। যদিও কলকাতা তুলনায় ভারতের নিরাপদ শহর বলে পরিচিত। দিল্লিতে বিজেপির সাংসদ বিধায়ক বলছেন, শাহিনবাগের জনতা নাকি বাড়ি গিয়ে ধর্ষণ করবে দিল্লিতে আপ জিতলে। ধর্ষণ একটা অস্ত্র বিজেপির। সেই অস্ত্র বারে বারে ব্যবহৃত। বিজেপি একটা মনুবাদী দল। মনুবাদীরা অনার্য নারীদের ধর্ষণ করা তাঁদের মুক্তি দেওয়া— বলে মনে করে।

যাক, আপাতত দিল্লিতে আপ জিতল।

তবু কলেজ ছাত্রীদের হোস্টেলে ঢুকে জয় শ্রীরাম বলে শৌচাগারে লুকিয়ে পড়া মেয়েদের সঙ্গে জঘন্য অসভ্যতা করা হয়েছে। জয় শ্রীরাম ধ্বনি দিয়ে ছাত্রীদের বিরুদ্ধে যৌন অপরাধ করা হয়েছে সংগঠিতভাবে।

জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের মিছিলে ঢুকে পুরুষ পুলিশ পোশাক ছিঁড়ে দিয়েছে। গোপনাঙ্গে কাঠ ও লাঠি দিয়ে আঘাত করেছে। এরা যত না পুলিশ তার চেয়ে বেশি সঙ্ঘী। অনেকেই আরএসএসের ক্যাডার। পুলিশের পোশাক তাঁদের দেওয়া হয়েছে অথবা তাদের পুলিশের চাকরি দেওয়া হয়েছে গত ছয় বছরে।

প্রসঙ্গত, দিল্লি পুলিশ কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। এবং দিল্লি এখন মোদি কথিত, 'রেপক্যাপিটাল'। এবং ভারত রিপাবলিক থেকে *রেপাবলিক*।

ভুল সংশোধন

আরেক রকম অষ্টম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় (১-১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০) প্রকাশিত প্রবন্ধ 'মাতৃত্ব যখন প্রতিরোধের ভাষা'-এর লেখকের নাম সুপূর্ণা ব্যানার্জি, ভুলবশত যা সুপর্ণা ব্যানার্জি ছাপা হয়েছে। এই অনিচ্ছাকৃত কিন্তু অমার্জনীয় ভুলের জন্য আমরা লেখক এবং পাঠকের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

—সম্পাদক

এনপিআর বয়কট কেন ও কীভাবে

প্রসেনজিৎ বসু ও শুভনীল চৌধুরী

ডিসেম্বর ২৪, ২০১৯ তারিখে কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট জাতীয় জনসংখ্যাপঞ্জি বা এনপিআর (National Population Register) নবীকরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই খাতে কেন্দ্র ৩৯৪১.৩৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। এই প্রক্রিয়া ২০২১ সালের জনগণনার সঙ্গে যৌথভাবে করা হবে বলে জানানো হয়েছে। জনগণনার অন্তর্গত প্রক্রিয়ায় প্রথমে সমস্ত বসতবাড়ির একটি তালিকা বানানো হয় (House Listing)। ক্যাবিনেট বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে যে এর সঙ্গেই এনপিআর প্রক্রিয়া যৌথভাবে চলবে ১ এপ্রিল ২০২০ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত। অসম ব্যতিরেকে সমস্ত রাজ্যে এই প্রক্রিয়া চালানো হবে। গত ৩১ জুলাই ২০১৯ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের এনপিআর সংক্রান্ত গেজেট বিজ্ঞপ্তিতেই (S.O. 2753E) ক্যাবিনেটের এই সিদ্ধান্ত শিলমোহর লাগিয়েছে।

এনপিআর-এর আইনি ভিত্তি নিয়েই আছে অনেক প্রশ্ন

এনপিআর তৈরি করার জন্য দেশে কোনো কেন্দ্রীয় আইন নেই। সেন্সাস বা জনগণনা করা হয় জনগণনা আইন ১৯৪৮-এর ভিত্তিতে। সেখানে এনপিআর-এর কোনো উল্লেখ নেই। ১৯৫৫ সালের মূল নাগরিকত্ব আইনেও এনপিআর-এর উল্লেখ নেই। এনপিআর-এর উল্লেখ একমাত্র রয়েছে নাগরিক পঞ্জিকরণ এবং জাতীয় পরিচয়পত্র সংক্রান্ত নাগরিকত্ব বিধি, ২০০৩-এ [Citizenship (Registration of Citizens and Issue of National Identity Cards) Rules]।

বাজপেয়ী সরকারের আমলে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন, ২০০৩-এর আওতায় এই নাগরিকত্ব বিধি ২০০৩, তৈরি করা হয়। এই বিধিতে জাতীয় নাগরিকপঞ্জি (এনআরআইসি) তৈরির বিশদ বিবরণ রয়েছে। সেই বিবরণ অনুযায়ী এনপিআর হল দেশজুড়ে এনআরসি তৈরি করার প্রথম ধাপ।

তাই, এনপিআর কোনো সংসদে পাশ হওয়া আইনের দ্বারা গঠিত নয়; শুধুমাত্র ২০০৩-এর নাগরিকত্ব বিধির মাধ্যমেই এনপিআর তৈরি করার কথা বলা হয়েছে। এই বিধিতে কোন কোন তথ্য এনপিআর মারফত সংগ্রহ করা হবে তারও কোনো স্পষ্ট বিবরণ নেই। শুধু এনআরসি-র ক্ষেত্রে কোন তথ্য নেওয়া হবে তার উল্লেখ রয়েছে। তাই এনআরসি ব্যতিরেকে এনপিআর-এর কোনো স্বাধীন আইনি ভিত্তি নেই।

নাগরিকত্ব বিধি ২০০৩ অনুযায়ী এনআরসি প্রক্রিয়া চালানো হবে চার ধাপে। প্রথম ধাপে এনপিআর মারফত দেশের সমস্ত বাসিন্দাকে নথিভুক্ত করা হবে। এনপিআর তৈরি হওয়ার পরের ধাপে 'সন্দেহজনক নাগরিক'দের (Doubtful Citizen) চিহ্নিত করা হবে। তারপর এই তথাকথিত সন্দেহভাজনদের নোটিশ পাঠিয়ে নথিপত্র জমা করে নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে বলা হবে। যারা প্রমাণ করতে পারবে না, তাদের বাদ রেখে তৃতীয় ধাপে এনআরসি তৈরি করা হবে।

কিন্তু কীভাবে 'সন্দেহজনক নাগরিক'দের চিহ্নিত করা হবে তার কোনো ভিত্তি নাগরিকত্ব বিধি ২০০৩-এ উল্লেখিত নেই। ফলত গোটা প্রক্রিয়াটিই সম্পূর্ণভাবে অস্বচ্ছ এবং বিপজ্জনক। দেশবাসীর নাগরিকত্ব নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করার অধিকার ন্যস্ত হয়েছে নিম্নস্তরের সরকারি আধিকারিকদের উপর, যাঁরা বিচারপতিদের মতন নিরপেক্ষ বিচার প্রদান করার ট্রেনিং-প্রাপ্ত নন। নথিপত্র যাচাই করে 'সন্দেহজনক নাগরিক'দের নাগরিকত্ব নির্ণয় করার ক্ষমতাও সরকারি আধিকারিকদেরকেই ন্যস্ত করা আছে, বিচারব্যবস্থাকে নয়। এর ফলে 'সন্দেহজনক নাগরিক' চিহ্নিতকরণের নামে দেশজুড়ে একটি অরাজকতা সৃষ্টি হওয়ার প্রভূত সম্ভাবনা। পুরো প্রক্রিয়াটির সাংবিধানিক বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন আছে।

তদুপরি, এনপিআর প্রক্রিয়ায় সকলের থেকেই ব্যক্তিগত তথ্য নেওয়া হবে, যদিও তার প্রয়োজনীয়তা, প্রাসঙ্গিকতা বা ব্যাপ্তি নিয়ে কোনো স্বচ্ছতা নেই। সুপ্রিম কোর্ট ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আধার মামলার রায়ে বলেছিলেন যে নাগরিকদের একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়গুলির গোপনীয়তা রক্ষা মৌলিক অধিকারের অন্তর্গত। সরকার কোনো স্বচ্ছ নীতি ছাড়া নাগরিকদের ব্যক্তিগত তথ্য প্রদান করতে বাধ্য করতে পারে না।

যদি এনপিআর শুধু জনগণনার জন্যই করা হয় তবে সেখানে ব্যক্তিগত তথ্যের প্রয়োজনীয়তা কোথায়? সেই তথ্যের সুরক্ষায় যেখানে কোনো আইনি রক্ষাকবচ নেই, সেখানে এহেন তথ্য সংগ্রহ করা কি জনগণের মৌলিক অধিকারকে বিপন্ন করে না? এনপিআর চালু করার আগে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলির মীমাংসা হওয়া প্রয়োজন।

অসমের এনআরসির প্রেক্ষিতে দেশজুড়ে এনআরসি

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে অসমে যে এনআরসি তৈরির প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়েছিল তা নাগরিকত্ব বিধি ২০০৩ নির্দেশিত জাতীয় নাগরিকপঞ্জি (এনআরআইসি) তৈরির প্রক্রিয়া থেকে আলাদা। অসমের সুনির্দিষ্ট সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে সুপ্রিম কোর্ট এনআরসি নবীকরণ প্রক্রিয়া চালু করার নির্দেশ দিয়েছিল। গোটা দেশের ক্ষেত্রে সেই প্রেক্ষাপটের কোনো প্রাসঙ্গিকতা নেই। অসমে কোনো এনপিআর হয়নি; সমস্ত আবেদনকারীকে সুনির্দিষ্ট দলিল পেশ করে প্রমাণ করতে হয়েছে যে তিনি বা তাঁর পরিবার ২৪ মার্চ ১৯৭১-এর পূর্বে অসমে বা ভারতের অন্যত্র বসবাস করতেন।

অন্যদিকে, নাগরিকত্ব বিধি ২০০৩ অনুযায়ী দেশজুড়ে নাগরিকপঞ্জি বা এনআরসি তৈরির লক্ষে প্রথম ধাপ এনপিআর তৈরি করা। এনপিআর তৈরি হওয়ার পর সেই তালিকা থেকে 'সন্দেহজনক নাগরিক' চিহ্নিত করে তাঁদের নাম বাদ দিয়ে নাগরিকপঞ্জি তৈরি হবে। অথচ নিজেকে নাগরিক প্রমাণ করার জন্য কোন নথিপত্র জমা করতে হবে, কোন তারিখের নিরিখে ভারতে বসবাসকারী হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করতে হবে, এই সব প্রশ্নের কোনো উত্তর ২০০৩-এর নাগরিকত্ব বিধিতে নেই। অতএব, ভুলবশত অথবা ইচ্ছাকৃত বঞ্চনার জন্য এনআরসি তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ার সম্ভাবনা অসমের তুলনায় গোটা দেশে অনেক বেশি হবে।

যদি এক অসমেই ৩.৩১ কোটি আবেদনকারীর মধ্যে ১৯ লক্ষের বেশি মানুষের নাম চূড়ান্ত এনআরসি থেকে বাদ গিয়ে থাকে, তবে সহজেই অনুমেয় যে ১৩০ কোটি জনসংখ্যার ক্ষেত্রে দেশজুড়ে এনআরসি-ছুটদের সংখ্যা কয়েক কোটি ছাড়িয়ে যাবে। গরিব, সামাজিকভাবে বঞ্চিত, আদিবাসী, দলিত, মুসলমান, পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু, অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মরত পরিযায়ী শ্রমিক, বিবাহের ফলে ভিটে পরিবর্তন করা নারী অথবা বিধবা মহিলা, এবং সমাজের অন্যান্য প্রান্তিক মানুষের ক্ষেত্রে এনআরসি তালিকা থেকে বাদ পড়ার সম্ভাবনা বেশি, কারণ এঁদের কাছে ৫০ বা ৭০ বছর আগের নথিপত্র জোগাড় করা প্রায় অসম্ভব।

অসমে এনআরসি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে ৫ বছর সময় লেগেছে, ৫২০০০ সরকারি কর্মচারী নিয়োগ করা হয়, এবং খরচ হয় ১২২০.৯৩ কোটি টাকা। গোটা দেশে এনপিআর করতে ইতিমধ্যেই বরাদ্দ করা হয়েছে ৩৯৪১.৩৫ কোটি টাকা। এর পরে এনআরসি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে আরো কয়েকগুণ টাকা লাগবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে খরচ না বাড়ানোর জন্য যেখানে সরকার সর্বদা টাকার অভাবের যুক্তি দেখায়, এই বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে সরকার কোন লক্ষ হাসিল করতে চাইছে?

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং বিজেপি-র নেতারা প্রায়শই বলছেন যে বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্যেই এনআরসি করা প্রয়োজন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আসলে বেআইনি অনুপ্রবেশের কোনোরকম তথ্য প্রমাণ নেই। তথ্যের অধিকার আইন, ২০০৫-এর আওতায় করা লেখকের প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৮-র অক্টোবরে লিখিতভাবেই সে কথা স্বীকার করে নেয়। তাই অনুপ্রবেশ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার বা বিজেপি যা বলছে, তা সবটাই গুজব এবং আন্দাজের উপর ভিত্তি করে।

১৯৭০-৮০-র দশকে অসম আন্দোলনের সময় অসমীয়া জাতীয়তাবাদীরা প্রচার করতেন যে ৫০ লক্ষ 'বিদেশি' নাকি অসমে ঢুকে পড়েছে। অথচ সুপ্রিম কোর্টের রায়ে দেওয়া তথ্য অনুসারে ১৯৮৫-র অসম চুক্তির পর থেকে জুলাই ২০১২ পর্যন্ত মাত্র ২৪৪২ জনকে বিদেশি চিহ্নিত করে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো গেছে। এর থেকেই বোঝা যায় যে এই ৫০ লক্ষ 'বিদেশি অনুপ্রবেশের' তত্ত্ব কতটা ভিত্তিহীন। তা সত্ত্বেও দিলীপ ঘোষের মতন বিজেপির নেতারা এখনও বলছে যে দেশে নাকি ২ কোটির বেশি 'বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী' আছে যার মধ্যে ৫০ থেকে ৭০ লক্ষের বাস নাকি পশ্চিমবঙ্গে! এনপিআর-এনআরসি করে নাকি এদেরকেই তাড়িয়ে দেওয়া হবে।

যে ১৯ লক্ষ মানুষ অসমে নাগরিকপঞ্জির তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন তাঁরা কি 'বিদেশি'? আসলে তাঁরা বাদ পড়েছেন নথিপত্রে নানারকম ভুল থাকার কারণে। দেশের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতির পরিবারের সদস্য, অসমের একজন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত সাহিত্যিক, সেনাবাহিনীর বহু অফিসার বা জওয়ান, এইরকম অনেকেই বাদ পড়েছেন অসমের এনআরসি তালিকা থেকে। ভারতের যে কোনো প্রান্তেই ৫০ বছর বা তারও আগের নথিপত্র দেখিয়ে নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে হলে বিশাল সংখ্যক মানুষই একইরকম ভাবে বিপদে পড়বেন। আর এই নথি-বিহীন মানুষকেই কেন্দ্রীয় সরকার 'অনুপ্রবেশকারী' হিসেবে দাগিয়ে দেবে।

অসমে ১৯ লক্ষ এনআরসি-ছুট মানুষের মধ্যে ১২ লক্ষ

বাঙালি হিন্দু, ৫ লক্ষ বাঙালি মুসলমান এবং বাকি ২ লক্ষের মধ্যে আছেন গোর্খা, বিহারি, আদিবাসী এমনকী বহু অসমীয়াভাষীও। এঁদের মধ্যে আছেন বহু মহিলা, শিশু এবং বয়স্ক মানুষ। এঁদের ভবিষ্যৎ কী হবে তা নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট বা কেন্দ্রীয় সরকার কোনো সদুত্তর দিতে পারছে না।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজেই একাধিকবার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হাসিনাকে জানিয়েছেন যে এনআরসি-ছুটদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর কোনো সম্ভাবনা নেই, এটা পুরোটাই ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়। অন্যদিকে এই লক্ষ লক্ষ মানুষকে 'ডিটেনশন সেন্টারে' বন্দি করে রাখার মতন পরিকাঠামো বা ব্যয়ক্ষমতা ভারত সরকারের নেই। অসমে যে ৬টি ডিটেনশন সেন্টার আছে, সেখানে বন্দি প্রায় ১ হাজার মানুষের মধ্যে ২৯ জনের ইতিমধ্যেই মৃত্যু ঘটেছে অসুস্থতা এবং চিকিৎসার অভাবে।

গোয়ালপাড়ায় যে নতুন 'ডিটেনশন ক্যাম্প' তৈরি করা হয়েছে কেন্দ্রীয় কোষাগার থেকে প্রায় ৫০ কোটি টাকা খরচ করে, সেখানে ৩ হাজারের মতন মানুষকে বন্দি করে রাখা যাবে। তা হলে ১৯ লক্ষ এনআরসি ছুট মানুষের মধ্যে যদি বেশ কয়েক লক্ষ অবশেষে ফরেনার্স ট্রাইব্যুনালে 'বিদেশি' সাব্যস্ত হন, তাঁদের বন্দী করতে কয়েকশো ডিটেনশন ক্যাম্প লাগবে আর তা বানাতে খরচ হবে কয়েক হাজার কোটি টাকা। করদাতাদের টাকার শুধু অপচয়ই নয়, এই বিপুল সংখ্যক মানুষকে দেশহীন বানিয়ে বন্দি করে রাখা হবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের কদর্যতম দৃষ্টান্ত। রাষ্ট্রপুঞ্জের শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশন এই ব্যাপারে ইতিমধ্যেই সতর্কবার্তা জারি করেছে।

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ ২০১৯) প্রসঙ্গে

যে-কোনো সভ্য দেশের সরকার অসমের ১৯ লক্ষ এনআরসি-ছুট মানুষের নাগরিকত্বের সংকটমোচন করাকে অগ্রাধিকার দিত। এই সমস্ত মানুষের জাতি-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা নির্বিশেষে ভারতের নাগরিকত্ব সুনিশ্চিত করার অধিকার কেন্দ্রীয় সরকারের আছে। কিন্তু তা না করে মোদী সরকার সংসদে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন, ২০১৯ (Citizenship Amendment Act, 2019) পাশ করিয়েছে, যেখানে বাংলাদেশ, পাকিস্তান আর আফগানিস্তান থেকে বেআইনি ভাবে আসা হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন, পারসি এবং খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের শরণার্থী হিসেবে গণ্য করে ৬ বছরের মধ্যে নাগরিকত্ব প্রদান করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মুসলমানদের ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ রাখা হয়েছে।

ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিকত্ব দেওয়ার কথা বলে এই আইনটি সরাসরি ভারতের সংবিধানের মৌলিক কাঠামোকে আঘাত করেছে। সংবিধানের ১৪ নম্বর ধাপ অনুযায়ী আইনের চোখে সমস্ত মানুষ সমান। অথচ সিএএ, ২০১৯-এর আওতায় মুসলমানদের ভারতের নাগরিকত্ব পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই; তাই এই আইনটি মুসলমানদের প্রতি স্পষ্টত বৈষম্যমূলক।

এটাও বুঝে নেওয়া দরকার যে সিএএ, ২০১৯-এর ফলে পূর্ববঙ্গের হিন্দু উদ্বাস্তুদেরও ভারতের নাগরিকত্ব পাওয়া মুশকিল। অসমে যে ১২ লক্ষের বেশি বাঙালি হিন্দু এনআরসি থেকে বাদ পড়েছেন, তাঁদের এই আইনের মাধ্যমে নাগরিকত্ব পেতে হলে প্রথমত লিখিতভাবে স্বীকার করে নিতে হবে যে তাঁরা এতদিন বেআইনিভাবে এদেশে বসবাস করেছেন; অর্থাৎ এনআরসি-তে অন্তর্ভুক্তির আবেদনে তাঁরা মিথ্যা বলেছেন। তদুপরি, ভারতের নাগরিকত্বের আবেদন করার সময় তাঁদের ধর্মপরিচয় এবং বাংলাদেশে বসবাসের প্রমাণ দেখাতে হবে। এহেন প্রমাণ যে অধিকাংশ উদ্বাস্তুই দেখাতে পারবেন না তা বলাই বাহুল্য। তা ছাড়া অসমে এনআরসি থেকে বাদ পড়া ১ লক্ষাধিক গোর্খা বা বিহারিরা কীভাবে প্রমাণ করবে যে তারা বাংলাদেশ, পাকিস্তান বা আফগানিস্তান থেকে এসেছে।

আসলে সিএএ ২০১৯ আইনটা একটা বড়ো ধাপ্পা ছাড়া আর কিছুই নয়। এর একমাত্র উদ্দেশ্য দেশজুড়ে সাম্প্রদায়িক বিভেদকে উশকে দেওয়া। হিন্দু হোক বা মুসলমান, এনআরসি থেকে বাদ পড়লে কারোর নাগরিকত্বের সংকটের সমাধান মোদী সরকারের নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের মাধ্যমে হবে না।

২০২০-র এনপিআর-এর কেন নির্দিষ্টভাবে বিরোধীতা?

দেশজুড়ে এনআরসি চালু করার কথা কিন্তু ২০০৩-এর নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের ১৪এ ধারাতেই বলা আছে। অর্থাৎ, দেশজুড়ে এনআরসি-র বিরোধিতা করতে হলে ২০০৩-এর নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের সর্বাত্মক বিরোধিতা করতে হবে।

দেশজুড়ে এনআরসি-র বিরুদ্ধে মানুষ রাস্তায় নামছে দেখে মোদী সরকার ইদানীং বলা শুরু করেছে যে এনআরসি চালু করা নিয়ে নাকি কেন্দ্রের এখনও কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। এটা একেবারেই বাজে কথা। যদি এনআরসি করা উদ্দেশ্য না হয়, তা হলে এপ্রিল মাস থেকে এনপিআর চালু করার নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে কেন?

মোদী সরকার বলছে যে ইউপিএ সরকার ২০১০ সালে প্রথমবার এনপিআর তৈরি করে যা ২০১৫ সালে সংশোধনও (Update) করা হয়। যদি ইউপিএ সরকারের আমলে একটি বেআইনি কাজ করা হয়ে থাকেও, তার মানে এই নয় যে মোদী সরকার জেনেবুঝে আবার একটি নিয়মবহির্ভূত কাজ করবে। তা ছাড়া ইউপিএ সরকারের ১৫ মার্চ, ২০১০-এর এনপিআর

সংক্রান্ত সরকারি বিজ্ঞপ্তি [S.O. 596E] আর মোদী সরকারের ৩১ জুলাই ২০১৯-এর বিজ্ঞপ্তির [S.O. 2753E] মধ্যে গুরুতর ফারাক হয়েছে।

ইউপিএ সরকারের বিজ্ঞপ্তিতে গোটা দেশে এনপিআর প্রস্তুত করার কথা বলা হয়েছিল, কিন্তু মোদী সরকারের বিজ্ঞপ্তিতে অসম ব্যতিরেকে বাকি সমস্ত রাজ্যে এনপিআর করার কথা বলা হয়েছে। ২০১৯ সালের বিজ্ঞপ্তিতে অসমকে বাদ রাখা প্রমাণ করে যে মোদী সরকার আসলে এনআরসি করতে বদ্ধপরিকর; অসমে যেহেতু ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এনআরসি হয়ে গেছে তাই সেখানে এনপিআর করতে সরকার আর ইচ্ছুক নয়। ইউপিএ সরকার কিন্তু ২০১০ সালে এনপিআর প্রস্তুত করার পর পরবর্তী পদক্ষেপগুলি নেওয়া থেকে বিরত থাকে। যার ফলে আজ পর্যন্ত দেশজুড়ে কোনো এনআরসি তৈরি হয়নি।

২০১৫ সালে মোদী সরকারের তত্ত্বাবধানে যে এনপিআর সংশোধিত হয় (৯৫১.৩৫ কোটি টাকা খরচ করে), তার তথ্য ব্যবহৃত হয় আধার তথ্যভাণ্ডারের সঙ্গে এনপিআর-এর সংযুক্তিকরণ করার উদ্দেশ্যে। এনপিআর-এর তথ্যভাণ্ডার কিন্তু তথ্য গোপনীয়তার কোনো বিধিনিষেধের আওতায় আসে না। অথচ ২০১৮-র সুপ্রিম কোর্টের আধার মামলার রায় ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তাকে মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছে।

২০১৮-র সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের আলোকে গোটা এনপিআর এবং এনআরসি প্রক্রিয়াটি জনগণের মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়, কারণ এক্ষেত্রে সরকার নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার ভয় দেখিয়ে নাগরিকদের ব্যক্তিগত তথ্য সরকারকে দিতে বাধ্য করছে। জনগণনা বা সেন্সাসের ক্ষেত্রে কিন্তু জনগণের দেওয়া ব্যক্তিগত তথ্য সম্পূর্ণভাবে গোপন রাখার আইনি রক্ষাকবচ রয়েছে; সেন্সাস আইনে পরিষ্কার বলা রয়েছে যে কেউই ওই তথ্য দেখতে পারবে না এবং কোনো মামলাতেও ওই তথ্য প্রমাণ হিসেবে গ্রাহ্য হবে না। এনপিআর-এর ক্ষেত্রে অনুরূপ রক্ষাকবচ নেই।

উপরন্তু, মোদী সরকার ২০২০-র এনপিআর-এর ক্ষেত্রে এমন কিছু নতুন প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত করেছে যা ২০১০-এর এনপিআর-এ ছিল না। আসন্ন এনপিআর-এর জন্য তৈরি করা সরকারি ম্যানুয়ালে (Instruction Manual for Updation of National Population Register 2020) দেখা যাচ্ছে যে প্রত্যেক বাসিন্দাকে তার নিজের নাম, বয়স, ঠিকানা ইত্যাদি জানানোর পাশাপাশি বাবা-মায়ের জন্মস্থান এবং জন্মের তারিখও জানাতে হবে। তার সঙ্গে আধার নম্বর, প্যান নম্বর, ভোটার কার্ড নম্বর, ড্রাইভিং লাইসেন্স নম্বর ইত্যাদিও জানাতে হবে।

শুধু জনগণনার জন্য যদি এনপিআর হত তা হলে এই তথ্যের প্রয়োজন আছে কি? বোঝাই যাচ্ছে যে এনপিআর-এর এই প্রশ্নগুলি এনআরসি তৈরি করার জন্যেই রাখা হয়েছে। যাদের মা অথবা বাবার জন্ম বাংলাদেশে হয়েছে তাদের সহজেই 'সন্দেহজনক নাগরিক' চিহ্নিত করে দেওয়া যাবে। নিজের আধার, ভোটার কার্ড, প্যান নম্বর হয়তো অনেকেরই আছে কিন্তু মা-বাবার জন্মস্থান বা জন্মের তারিখের প্রমাণ কতজনের কাছে রক্ষিত আছে? এইরকম একটা এনপিআর-এর ভিত্তিতে যদি আগামীদিনে এনআরসি তৈরি করা হয় তা হলে তার পরিণতি কী মারাত্মক হবে তা সহজেই অনুমেয়।

এনপিআর বয়কট কীভাবে?

লক্ষণীয় যে মোদী সরকার বারবার বলছে 'এখন পর্যন্ত' ('till now') এনআরসি সংক্রান্ত কোনো সিদ্ধান্ত তারা নেয়নি। কিন্তু ভবিষ্যতে যে তারা এনআরসি করবে না, সে কথা তারা কখনো বলছে না। একবার এনপিআর তৈরি হয়ে গেলে বাকি ধাপগুলি করার জন্য সরকারের জনগণের সহযোগিতার কোনো প্রয়োজন হবে না। কেন্দ্রীয় নির্দেশিকা এলেই দপ্তরে বসে সরকারি আধিকারিকরা 'সন্দেহজনক নাগরিক' চিহ্নিত করার কাজ শুরু করে দিতে পারবেন। জেনেবুঝেই মোদী সরকার এনআরসি আর এনপিআর নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে, যাতে জনগণকে ভুল বুঝিয়ে এনপিআর-এর কাজটা সম্পন্ন করে ফেলা যায়।

তাই এনআরসি-র নামে নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার প্রক্রিয়ার যাঁরা বিরোধী, তাঁদের সকলকেই সোচ্চারে এনপিআরের বিরোধিতাও করতে হবে। মোদী সরকার যাই বলুক, এনপিআর এনআরসি-র প্রথম ধাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। এই এনপিআর প্রক্রিয়া যাতে কোনোভাবেই এপ্রিল মাস থেকে চালু না করা হয় সেটা সুনিশ্চিত করাই আজকে সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন, গণতন্ত্রপ্রিয় নাগরিকের কর্তব্য।

বাম-শাসিত কেরালা, তৃণমূল কংগ্রেস শাসিত পশ্চিমবঙ্গ এবং কংগ্রেস শাসিত পাঞ্জাব, রাজস্থান এবং মধ্যপ্রদেশ সরকার মিলিয়ে মোট পাঁচটি রাজ্য সরকার সিএএ-র বিরোধিতা করে বিধানসভায় প্রস্তাব পাশ করেছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কেরালা এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকার ব্যতিরেকে আর কোনো রাজ্য সরকারই এনপিআর চালু করার বিরুদ্ধে কোনো সরকারি অবস্থান নেয়নি। পশ্চিমবঙ্গেও এনপিআর-এর জন্য সরকারি আমলাদের ট্রেনিং দেওয়ার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল। এনআরসি-এনপিআর-সিএএ বিরোধী গণআন্দোলনের চাপেই রাজ্য সরকার এনপিআর স্থগিত ঘোষণা করেছে।

এই পরিস্থিতিতে গ্রাম-শহরে এনপিআর চালু করার বিরুদ্ধে

গণ-প্রতিরোধ গড়ে তোলা প্রয়োজন। জনসাধারণের মধ্যে এনপিআর-এর বিপজ্জনক, জনবিরোধী চরিত্র নিয়ে ব্যাপক সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। ধর্ম-ভাষা-জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত অংশের মানুষকে সামিল করতে হবে এই প্রতিরোধে। মহিলাদের এই বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা নেওয়া জরুরি।

এই প্রতিরোধ হতে হবে শান্তিপূর্ণ কিন্তু দৃঢ় এবং ঐক্যবদ্ধ বয়কটের মাধ্যমে। প্রত্যেকটি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পুরসভায়, গ্রামসভা বা ওয়ার্ডসভা করে প্রস্তাব পাশ করাতে হবে যে ১ এপ্রিল ২০২০ থেকে জনগণনার সঙ্গে কোনোভাবেই এনপিআর-এর প্রক্রিয়া চালু করা যাবে না। এনপিআর-এর প্রশ্নপত্র নিয়ে সরকারি আধিকারিকরা যেন কোনোভাবেই বাড়ি-বাড়ি না যান, সেটা রাজ্য সরকারকে সুনিশ্চিত করাতে হবে। কোনো জায়গায় যদি এর ব্যতিক্রম হয়, তা হলে জনগণ যেন কিছুতেই এনপিআর-এর প্রশ্নমালার জবাব না দেন তা সুনিশ্চিত করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন বাড়ি-বাড়ি গিয়ে নিবিড় প্রচার। দলমত নির্বিশেষে, সমস্ত জনদরদি মানুষ, বিশেষত শিক্ষিত ছাত্র-ছাত্রী-যুবরা এই প্রচারে এগিয়ে আসবেন, এটাই কাম্য।

একবার যদি এনপিআর আটকে দেওয়া যায় তা হলে এনআরসি-সিএএ-এর মাধ্যমে মোদী সরকার কোটি কোটি মানুষের নাগরিকত্ব নিয়ে যে বিভাজনের খেলায় নেমেছে তা মুখ থুবড়ে পড়বে। তারপর ২০০৩-এর জনবিরোধী আইন এবং বিধিকে বাতিল করে সকল ভারতবাসীর নাগরিকত্বকে সুনিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় সরকারকে বাধ্য করা যাবে।

এই প্রবন্ধের একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে ‘এই সময়’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

ছবি : সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

অপ্রকাশিত রাশিয়ার জার্নাল থেকে

বিপ্লবের স্বপ্ন

অরুণ সোম

সন্ধে, জানুয়ারি ১৯৯২। এসেছিলাম ১৯৬৭-র সেপ্টেম্বরে। দেশটা তখন ছিল স্বপ্নের দেশ। এক বছরের জন্য মস্কো রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে রুশ ভাষা ও সাহিত্যচর্চার ফেলোশিপ নিয়ে। তখন দেশটার নাম ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। সেটা ছিল বিপ্লবের দেশ। বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রাণকেন্দ্র। আজ থেকে তার আর কোনো অস্তিত্ব রইল না। পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে গেল সোভিয়েত ইউনিয়ন।

সাবধান হয়েই এসেছিলাম দেশ থেকে। নিউ মার্কেট থেকে গরম কাপড়ের একজোড়া লেগিংস এবং গেঞ্জিও কিনে ফেললাম, ধর্মতলার জে. এস. মহম্মদ আলির দোকানে অর্ডার দিয়ে সার্জ কাপড়ের গলাবন্ধ কোট আর প্যান্টও বানিয়ে ফেললাম, বাটার পুরু সোল দেওয়া অ্যাম্বেসাডর জুতোও একজোড়া কিনে ফেললাম, বুদ্ধি খাটিয়ে এক সাইজ বড়োই কিনলাম, যাতে ভিতরে ডবল মোজা পরা যায়। সেগুলোর কোনোটাই বিশেষ কাজে এল না। এসেছিলাম সেপ্টেম্বর নাগাদ, এরা যাকে সোনালি শরৎ বলে সেই সময়টাতে। সোনালি পাতা ঝরার সময়। সত্যিকারের শীতকাল আসতে তখনও প্রায় মাস দুয়েক বাকি।

আসার কয়েকদিন পরে প্রমোদভ্রমণে মস্কো ঘুরিয়ে যা যা দেখানো হল— ক্রেমলিন থেকে শুরু করে তার কোনোটাই আমার অচেনা ছিল না: কতবারই না দেখেছি চলচ্চিত্রের পর্দায় আর স্থির আলোকচিত্রে— তবে কিনা সাদায় কালোয়— তখনও রঙিন চিত্রের তেমন একটা রমরমা হয়নি। কিন্তু সেটাই ছিল স্বপ্নকে রঙিন করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট। এখন মনে হচ্ছিল স্বপ্ন যেন বাস্তবের রংরূপ নিতে চলেছে।

তবে যা জানা ছিল না তা এদেশের মানুষজন, যদিও কতকটা জেনেছি গল্প উপন্যাস অন্যান্য বিবরণ পড়ে বা ছবি দেখে। আর হ্যাঁ, আবহাওয়া— তারও সঠিক পরিচয় কিন্তু বিবরণে বা ছবিতে পাওয়া ভার। আমার দৌড় তখন কাশ্মীর পর্যন্তও নয়— বড়োজোর দার্জিলিং পর্যন্ত— তাও তেমন একটা শীতে নয়। কিন্তু এ ঠান্ডা স্বপ্নে কোনোমতেই অনুভবযোগ্য নয়।

শুনলাম রেড স্কোয়ারে অক্টোবর বিপ্লব বার্ষিকীর সামরিক কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। বিরল সৌভাগ্য! কিন্তু ৭ নভেম্বর তারিখটাই বড়ো গোলমেলে। আসলে তো বিপ্লব ঘটেছিল ২৫ অক্টোবর— অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব’ নামেই তার পরিচয়। এই অসংগতির কারণ এদেশে বিপ্লবের আগে পর্যন্ত যে জুলিয়ান ক্যালেন্ডার প্রচলিত ছিল সেই অনুযায়ী ঘটনা ঘটেছিল ২৪-২৫ অক্টোবর মধ্যরাতে, পৃথিবীর সর্বত্র প্রচলিত গ্রিগোরিয়ান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী যা আসলে ৭ নভেম্বর। এদিনের আবহাওয়াটাও সচরাচর ভারি গোলমেলে— হেমন্তের শেষ, শীতের শুরু: তাপমাত্রা যখন তখন হিমাঙ্কের নীচে নেমে যায়, যখন তখন বরফ পড়তে পারে— সে বরফও আবার ভিজে স্যাঁতসেঁতে। আকাশের মুখও বেশির ভাগ সময়ই গোমড়া।

রাতে উত্তেজনায় ভালোমতো ঘুম হল না। রওনা দিতে হবে খুব ভোরে। ভোর মানে সকাল আটটা। কিন্তু এখানে তখনও রাতের অন্ধকার পুরোপুরি কাটে না। দশটায় রেড স্কোয়ারে সামরিক কুচকাওয়াজ ও অস্ত্রপ্রদর্শনী শুরু। ভীষণ কড়াকড়ি। অন্তত আধঘণ্টা আগে পৌঁছুতে না পারলে ভেতরে ঢুকতেই দেওয়া হবে না। ঠান্ডা, বিশেষত, হিমেল হাওয়ার সঙ্গে লড়াই করার জন্য একটা ভারী ওভারকোট আর একটা কানঢাকা ফারের টুপিও ইতিমধ্যে জোগাড় হয়ে গেছে। বরফ এখনও পড়ছে না বটে, কিন্তু পড়তে কতক্ষণ?

আমাদের জায়গা হয়েছে উৎসব উপলক্ষে রেড স্কোয়ারে ক্রেমলিনের প্রাচীর ঘেঁষে, লেনিন স্মৃতিসৌধের দুধারে সাময়িকভাবে তৈরি গ্যালারির বাঁ দিকে। সে জায়গা পর্যন্ত পৌঁছুতে পাঁচটি নিরাপত্তার বলয় পার হতে হল। পাঁচবার পরীক্ষা করা হল আমাদের পরিচয়পত্র। না, না। আজকের

দিনের মতো মেটাল ডিটেক্টর বা কুকুর দিয়ে তল্লাশির কোনো ব্যবস্থা ছিল না। পুরো ব্যবস্থাটাই যেমন সুন্দর তেমনি সুশৃঙ্খল। কোনো হইহল্লা ঠেলাঠেলি সে সব কিছুই নেই।

গ্যালারি শুধুই দাঁড়িয়ে থাকার জায়গা। ওই ঠান্ডার মধ্যে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হবে আরো অন্তত আধ ঘন্টা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা দাবড়ানো এবং দেশাত্মবোধক সংগীত শোনা ছাড়া আর কিছু করার থাকছে না। অনুষ্ঠান শুরু হল কাঁটায় কাঁটায় দশটায়।

লেনিন স্মৃতিসৌধের মাথার ওপর থেকে রাষ্ট্র প্রধানের ভাষণ, স্থল বাহিনীর ঘোড়সওয়ার, ট্যাঙ্ক ও পদাতিক সৈন্যদলের এবং নৌ ও সেনাবাহিনীর কুচকাওয়াজ, সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক ও প্রতিরক্ষামন্ত্রীর অভিবাদন গ্রহণ, অস্ত্রপ্রদর্শনী- এও সব সামরিক সমারোহ অথচ তার মধ্যে বিভীষিকা বা আতঙ্কের কিছু নেই, আছে এমন এক বিপুল শক্তি, ভাবগম্ভীর সৌন্দর্য সুষমা ও শৃঙ্খলাবোধ যাতে এই মনে করে বুক ভরে ওঠে যে বিপ্লব ও তার ঐতিহ্য সুরক্ষিত।

ঘণ্টাখানেকের এই অনুষ্ঠানের শেষে নাগরিকদের স্বতঃস্ফূর্ত মিছিল। এই মিছিল অবধি, স্বতঃস্ফূর্ত, উল্লাস মুখরিত, কিন্তু শৃঙ্খলাবদ্ধ, ফুল, বেলুন আর ফেস্টুনের সমারোহ, নারী পুরুষ আর শিশুদের সমাবেশ, অনেক পুরুষ মানুষের কাঁধে তাদের শিশুসন্তানরা, সবটাই বর্ণসুষমামণ্ডিত আবেগ উচ্ছাসময় ও ব্যঞ্জনাধর্মী— যেন এই বাণীই বহন করছে যে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্বশান্তির রক্ষাদূর্গ। মুগ্ধ হয়ে দেখছিলাম।

এতক্ষণ একটা ঘোরের মধ্যে ছিলাম। মিছিল শেষ হতে এবারে শারীরিক অনুভূতিটাই প্রবল হয়ে উঠল। এতক্ষণ ঠান্ডায় একঠায় দাঁড়িয়ে পা অবশ হয়ে গেছে। হাত পা খেলানো দরকার। একটু গরম চা পেলে হত। কিন্তু এখানে কে আর রাস্তায় গরম চা বিক্রি করবে?

শতাব্দী শেষ হতে চলল। থমকে গেল বিপ্লবের জয়যাত্রা।

পালটে যাচ্ছে ইতিহাসের গতিপথ

৭ নভেম্বর, ১৯৯১। ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের জন্য কমিউনিস্টদের সংগঠিত গত ১৯ আগস্টের অভ্যুত্থান তিন দিনের মাথায়-২১ আগস্ট অবদমিত হল। এই সুযোগে গর্বাচ্যোভপন্থী ছদ্ম কমিউনিস্টদের হাত থেকে দেশের প্রকৃত ক্ষমতা আমূল সংস্কারপন্থী ইয়েলৎসিনদের হাতে চলে গেল। 'Regime Change'-এর জন্য পশ্চিমের সরাসরি হস্তক্ষেপের অপেক্ষায় থাকতে হল না।

এই ঘটনার আরো বছর দুয়েক আগে একটি প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য ঘটিয়েছিল লাল অক্টোবরের অন্তর্ঘাতী প্রতিপক্ষ। ১৯৪৫ সালের ৯ মে, ৮.৬ মিলিয়ন সোভিয়েত সৈনিকসমেত মোট ২৭ মিলিয়ন সোভিয়েত নাগরিকের প্রাণের বিনিময়ে নাৎসি জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করে রাইখস্টাগের মাথার ওপর সোভিয়েত ইউনিয়নের লাল পতাকা তুলেছিল সোভিয়েত সৈনিকরা। সেই থেকে দিনটি সে দেশে ‘বিজয় দিবস’ নামে মহাসমারোহে উদযাপিত হয়ে আসছে। ১৯৮৯ সালে সেই বিজয় উৎসব উদযাপনের ঠিক ছয় মাস পরে, আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে অক্টোবর বিপ্লব বার্ষিকী উদযাপনের দুদিন পরে, ৯ নভেম্বর পরবর্তীকালে সংগত কারণেই জার্মানিতে ‘জার্মানির শ্রেষ্ঠ সন্তান’ আখ্যায় ভূষিত সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক দেশের হর্তাকর্তা বিধাতা মিখাইল গর্বাচ্যোভের প্রশ্রয়ে ধসে পড়ল বার্লিন প্রাচীর, আরো বছর আড়াই সময়ের মধ্যে সেই প্রাচীরের ধ্বংসস্তূপের চাপে পড়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন দেশটারই সৌধ ভেঙে পড়ল। সবই চলছিল পরিকল্পনামাফিক। বার্লিন প্রাচীর ভাঙার পর বছর ঘুরতে না ঘুরতে ১৯৯০ সালের অক্টোবরে আন্তর্জাতিক নোবেল কমিটি আগাম পুরস্কার হিসেবে গর্বাচ্যোভকে নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত করল। এই সব ঘটনা পরম্পরা কি নিছক কাকতালীয় না অন্য কিছু সে বিচার ঐতিহাসিকরাই করবেন। কিন্তু দৃশ্যত এ সবই যেন প্রতিবিপ্লবের প্রস্তুতি ও তার চূড়ান্ত পরিণতির লক্ষণক্রান্তি।

অবশ্য এটা ঠিক যে অক্টোবর বিপ্লব বহু দিন যাবৎ অক্টোবর অভ্যুত্থান নামেই প্রচলিত ছিল— অন্তত ১৯২৭ সাল পর্যন্ত বলশেভিকদের নিজেদের মূল্যায়নেও তাই ছিল। বস্তুত বিপ্লব বলতে যা বোঝায় তা বোধহয় ১৯১৭-র ফেব্রুয়ারিতেই হয়েছিল— সেটা ছিল জারতন্ত্র উৎখাত করে বুর্জোয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিপ্লব। সেই বিপ্লবের ভেতর থেকে আচমকা অভ্যুত্থান ঘটিয়ে সাময়িক সরকারের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয় তার অন্যতম শরিক বলশেভিকরা। এমনকী ১৯১৯ সালেও স্বয়ং লেনিন কমিন্টার্নের প্রথম অধিবেশনে অক্টোবর অভ্যুত্থানকে আসলে বুর্জোয়া বিপ্লব নামে অভিহিত করেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর আরো একটি বক্তব্য আরো তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেছিলেন, অভ্যুত্থানের মূল লক্ষ ক্ষমতা দখল, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নির্ধারিত হয় ক্ষমতা দখলের পরে।

সমাজতন্ত্র দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে স্তালিন ব্যক্তিগত মালিকানা, মুনাফা ও বাজারের বিলোপসাধন করেছিলেন— সেটা বিপ্লবের বেশ কিছুকাল পরে। লেনিন নিজে এই তিনটি ব্যবস্থা উচ্ছেদের পক্ষপাতী হলেও উপস্থিত বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনা করে ১৯২১ সাল থেকে নয়া অর্থনৈতিক নীতি নামে এক মিশ্র অর্থনীতির প্রচলন করে ব্যক্তিগত মালিকানা ব্যবস্থা মুনাফা ও বাজার অর্থনীতি আংশিকভাবে ফিরিয়ে আনতে বাধ্য

হন। তার অর্থ এটাই যে দেশ তখনও পুরোপুরি সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলনের উপযোগী বলে তাঁর মনে হয়নি। ১৯২৪ সালে লেনিনের মৃত্যুর পরও ত্রিশের দশকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত সেই ব্যবস্থা অব্যাহত ছিল। পরবর্তীকালে, ত্রিশের দশকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে তার স্থান নিয়েছিল সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাই তো ১৯২৮-এর আগে হয়ে উঠতে পারেনি।

বিপ্লব ও সঠিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নির্ধারণের মাঝখানের এই ফাঁকটাতেই রুশ বিপ্লবের পর একটি আমলাচক্র পার্টি, প্রশাসন, সামরিক বাহিনী, পরিকল্পনাদপ্তর অর্থাৎ রাষ্ট্রের সর্বস্তরে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দখল করে নিয়েছিল, যার ফলে সমাজতন্ত্রের ভিতটাই আর পাকাপোক্ত হওয়ার অবকাশ পেল না।

আরো একটি কথা: সমাজবিপ্লবের প্রায় সর্বক্ষেত্রেই অভ্যন্তরীণ ঘটনা ছাড়াও কোনো বিদেশি শক্তির স্বার্থও কাজ করে। জারতন্ত্রের উৎখাত ঘটিয়ে রাশিয়ায় যে বিপ্লব সংঘটিত হয় তার পেছনে যেমন জার্মানির সরাসরি মদত ছিল, তেমনি গ্রেট ব্রিটেনেরও প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয় ছিল, যেহেতু জার সরকার বরাবর ওই দুই দেশেরই মাথাব্যথার কারণ ছিল। রুশ বিপ্লবের হোতা লেনিনকে তো সেই সময় তাঁর নিজের দেশের অনেকে 'জার্মান চর' বলেও অভিহিত করত। জারের উৎখাতের খবর পেয়ে তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ উল্লসিত হয়ে বলে উঠেছিলেন: 'বিশ্বযুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল।' মার্কিন প্ররোচনায় সংঘটিত সেই যুদ্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল রাশিয়ার কাঁচামালের বাজার দখল করা, সেই সঙ্গে ইঙ্গ-মার্কিন জোটের প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি জার্মানিকেও অকেজো করে দেওয়া, অর্থাৎ রাশিয়া ও জার্মানিকে পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে উভয়কেই নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া। তাই রাশিয়ার শেষ জার নিকলাই রমানভ তৎকালীন নিকট আত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে উদ্ধার করার জন্য যেমন গ্রেট ব্রিটেনের তেমনি জার্মানিরও কোনো আগ্রহ দেখা যায়নি।

জারতন্ত্র উৎখাতের পর অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মাধ্যমে ব্রিটিশ-রুশ পুঁজির আঁতাত রুশদেশে অত্যন্ত প্রভাবশালী শক্তি হয়ে উঠেছিল ঠিকই। কিন্তু অনতিকালের মধ্যে বলশেভিকদের অক্টোবর অভ্যুত্থান ঘটে যাওয়ার ফলে সব ছক পালটে গেল। ভুল শোধরানোর জন্য পশ্চিমি শক্তিগুলি রাশিয়ার অভ্যন্তরে হস্তক্ষেপ করে গৃহযুদ্ধের ইন্ধন জোগাতে লাগলে— অনেকটা আজকের দিনের মতোই উপপ্লব ঘটিয়ে জোর জবরদস্তি Regime Change ও বাজার দখলের লড়াই।

পেরেস্ত্রৈকা পর্বের রাশিয়াতে বলশেভিক কায়দায় সোভিয়েত সরকারের ভেতর থেকে অতর্কিতে আরো একটি অভ্যুত্থান ঘটিয়ে কমিউনিস্টরা ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল ১৯৯১-এর ১৯ আগস্ট। কিন্তু তিন দিনের মাথায় তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে পরিণামে সোভিয়েত ইউনিয়ন তথা সমাজতন্ত্রের পতনকেই ত্বরান্বিত করে দিয়েছিল। এ ধরনের হঠকারী রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রকে বোধহয় সচরাচর 'পুচ' (Putsch) আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে।

আর মাত্র মাস দুয়েকের অপেক্ষা। ইতিহাসের গতিপথ পালটে যাচ্ছে। কিন্তু এখন থেকেই অক্টোবর বিপ্লব আর বিপ্লব নয়— অভ্যুত্থান মাত্র। তাই জাতীয় উৎসবের তালিকায় তার নাম রাখা যাচ্ছে না। এ বছরও দিনটা ছুটির দিন থাকছে, যেহেতু যথাসময়ে নতুন সরকারি নির্দেশ জারি করা সম্ভব হয়নি। ভবিষ্যতে তাও থাকবে না। আজকের এই ছুটি কোনো কিছুর জন্যই নয়— অকারণ। এমন ছুটি শুধু রাশিয়াতেই সম্ভব! 'রাশিয়া এমনই একটা দেশ, যেখানে', গোগলের কথায়, 'অসম্ভবও সম্ভব।'

আজকের মতো ভবিষ্যতেও ৭ নভেম্বরের এই বিশেষ দিনটিতে ক্রেমলিনের রেড স্কোয়ারে আর দেখা যাবে না রেড স্কোয়ার ছাপিয়ে যাওয়া শ্রমিক ও মেহনতি জনতার সুবিশাল সমাবেশ, অবিরত জনস্রোত।

অমনিতেও সাধারণ লোকজনের কারোরই উৎসবের শোভাযাত্রায় যোগদানের কোনো তাড়া নেই, নেই কোনো আগ্রহ। জনতার ভিড় খাবারের দোকানের সামনে— দুধ আর রুটির জন্য মাইলখানেক লম্বা লাইন— আক্ষরিক অর্থে। উৎসবের আনন্দের স্থান নিয়েছে মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই।

অবাধ বাণিজ্যের গোলকধাঁধায়

এপ্রিল, ১৯৯১। দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ঘটল সোভিয়েত ইউনিয়নে। সরকারি অর্থনৈতিক কর্মপন্থা সম্পর্কে ঘোরতর সন্দেহ দেখা দিল লোকের মনে। কিন্তু এটা যে বাজার অর্থনীতির প্রথম ধাপ সেটা কারো মাথায় ঢুকল না। সাধারণ মানুষের ধারণা হল সোনার কাঠি আছে গর্বাচ্যোভের প্রতিদ্বন্দ্বী ইয়েলৎসিনের হাতে। কিন্তু কিছুদিন বাদে ইয়েলৎসিন পুরোপুরি ক্ষমতায় চলে এলে দ্রব্যমূল্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ 'সম্পূর্ণ ছেড়ে দেওয়া হল, পুরোমাত্রায় বাজার অর্থনীতি চালু হয়ে গেল। চালু হল আরও অনেক কিছু। যে সমস্ত কারণে রুশ বিপ্লব ঘটেছিল সে সবই আবার ফিরে এল।

৭ নভেম্বরের উৎসবটি গত বছরই ছোটো করে করা হয়েছিল। বাদ দেওয়া হয়েছিল রেড স্কোয়ারে সামরিক কুচকাওয়াজ। তবে কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে বেরিয়েছিল সুবিশাল একটি গণমিছিল। রেড স্কোয়ারে উপস্থিত ছিলেন

গর্বাচ্যোভ। কিন্তু গত বছর ওই মিছিল থেকেই কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক গর্বাচ্যোভের বিরুদ্ধে স্লোগান উঠেছিল। তিনি যদিও সেদিন তাঁর ভাষণে বলেছিলেন যে 'আমরা দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছি এক নতুন জগতের দিকে— কমিউনিজমের জগতে' কিন্তু জনতা তাঁর মুখের কথায় ভোলেনি। বেগতিক দেখে বন্ধ করতে হয়েছিল ওই অনুষ্ঠানের দূরদর্শন সম্প্রচার। বিক্ষোভ এড়াতে ভাষণ অসমাপ্ত রেখে রেড স্কোয়ার ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল গর্বাচ্যোভকে।

৩০ ডিসেম্বর, ১৯৯১। একরকম জোর করেই আমাকে ওর গাড়িতে তুলল তোলিয়া। বহুদিনের বন্ধু। গাড়িটা নতুন। নতুন আর্বাতের রাস্তা ধরে গাড়ি ছুটছিল হু-হু করে। তোলিয়া বলল, 'গাড়ি তো কিনলাম। এখন দেখি হাতি পোষা যায় কদ্দিন।' স্টিয়ারিং-এ হাত রেখে বলল, 'আগে মস্কোর অটো সার্ভিস স্টেশনগুলিতে গাড়ি ধোয়া যেত ১ রুবলে। এখন রাস্তাঘাটে বাচ্চা ছেলেরা গাড়ির কাচ মুছে দিয়ে ৩ রুবল চায়। তাতেও মন ওঠে না ওদের। বলে, ডলার পেলে ভালো হয়।' তোলিয়ার কথা শেষ হতে-না-হতেই লালবাতি জ্বলে উঠল ট্রাফিক সিগন্যালে। কোত্থেকে একটি বাচ্চা ছেলে স্প্রে আর তোয়ালে হাতে চলে এল গাড়ির সামনে। স্প্রে করার পর তোয়ালে দিয়ে মুছে নিমেষে ঝকঝকে করে তুলল আমাদের গাড়ির সামনের কাচটিকে। লালবাতি সবুজ হতেই জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল ছেলেটি। তার হাতে তিনটি রুবল ফেলে দিল তোলিয়া। আমাকে তাজ্জব বনতে দেখে তোলিয়া বলল, 'নতুন সোভিয়েতের (নামটা চলছিল তখনও) নতুন মানুষ এরা। আমরা পুরোনোই রয়ে গেলাম।' তোলিয়াকে বললাম, গাড়িটাকে দাঁড় করাও দেখি রাস্তার একপাশে। 'নতুন মানুষদে'র আরেকটু দেখি। চার-পাঁচটা বাচ্চা ছেলের জটলার সামনেই গাড়ি দাঁড় করাল তোলিয়া। হই-হুল্লোড়ের মধ্যেই সিগন্যালের দিকে তাকাচ্ছে ছেলেগুলো। লালবাতি জ্বললেই গাড়ির কাচ মুছে রুবল আদায় করবে। কাছে পেয়ে প্রশ্ন করলাম একটি ছেলেকে, যেরকম জোরে গাড়ি চলে এই রাস্তায়, তাতে যে-কোনো সময় তোমরা গাড়ি চাপা পড়তে পারো। এরকম ঝুঁকি নিচ্ছ কেন? কথাটা শুনেই ছেলেগুলো হো হো করে হেসে উঠল। একজন বলল, 'ঝুঁকি না নিলে রুবল মিলবে কোত্থেকে?' গোটাকয়েক প্রশ্ন করলাম ওদের। জবাবও পেলাম চটপটে। 'স্কুলে যাও না?' জবাব এল, 'যাই। কয়েকটা ক্লাসের পরেই এখানে চলে আসি। আর আসি ছুটির দিন, শনি ও রবিবার।' বাড়িতে পড়ো কখন? সিগনাল দেখতে দেখতে একটি ছেলে বলে উঠল, 'অত পড়াশোনা করে কী হবে? আমার মা-বাবা দু-জনেরই অনেক ডিগ্রি আছে। দুজনেই রোজগার করে। তবে গাড়ির কাচ মুছে এখন দুজনের চেয়েই আমি বেশি রোজগার করি। এর মধ্যে আরেক জন ব্যঙ্গ করে বলল, আরো রোজগার করতে পারতাম। কিন্তু 'ট্যাক্স' দিতে হয় যে আমাদের।' 'ট্যাক্স' মানে? তাকালাম তোলিয়ার দিকে। বন্ধু বলল, পুলিশকে রোজ মাথাপিছু ২০ রুবল দিতে হয়। আমি অবাক! তা হলে মস্কোতেও পুলিশ এখন ঘুস নেয়! এর মধ্যে আবার লালবাতি। দাঁড়ানো গাড়ির ভিড়ে হারিয়ে গেল ছেলেগুলো।

সেদিন একটি ঘোষণা শুনছিলাম রেডিয়োতে। তার মূল বক্তব্য ছিল, পশ্চিমি দুনিয়ার মতো এদেশের ছেলেমেয়েদের ছোটোবেলা থেকে স্বাবলম্বী হওয়া উচিত। পড়াশুনার জন্য যে পয়সা খরচ হয়, মার্কিন মুলুকে ছেলে-মেয়েরা তা রোজগার করতে না পারলে মা-বাবার কাছ থেকে ধার নেয়, পরে নিজেরা রোজগার করে তা শোধ করে। পাশে বসেছিল আমার এক প্রতিবেশীর নাতি। বলে উঠল, 'এক্কেবারে ঠিক কথা। ওইভাবে চলতে হবে আমাদেরও।'

১৬ জুন, ১৯৯২ দেশটা যতদিন 'নিষিদ্ধ দেশ' নামে পরিচিত ছিল ততদিন জানতাম 'চোরাকারবারি' বা 'ফাটকাবাজ' কথাগুলি এদের অভিধানে নেই। সত্য যখন উপলব্ধি করতে পারলাম তখন মনকে প্রবোধ দিতাম এই বলে যে ওরকম লোকের সংখ্যা এদেশে নগণ্য। কিন্তু দুষ্ট ক্ষত যে কতদূর ছড়াতে পারে তার প্রমাণ পাওয়া গেল সত্তরের বছরগুলির শেষ দিকে। চোখের সামনে আমরা দেখতে পেলাম রমরমা অবস্থা একশ্রেণির মানুষের, আয়ের সঙ্গে যাদের ব্যয় মেলে না, যাদের গাড়ি, কো-অপরেটিভের বাড়ি, শহরের বাইরে বাগানবাড়ি আর মোটা ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স। উৎকোচ, স্বজনপোষণ, দুর্নীতি ততদিনে ঢুকে গেছে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। দেখা দিয়েছে এক সুবিধাভোগী শ্রেণি— পেরেস্ত্রৈকা এদের জন্য, না এদের বিরুদ্ধে— সাধারণ লোক বুঝতে-না-বুঝতে এরাই রাতারাতি ভোল পালটে পেরেস্ত্রৈকার ধ্বজাধারী হয়ে দাঁড়াল।

পুনর্গঠনের সঙ্গে প্রকাশ্যতার সংযোগে পেরেস্ত্রৈকার আমলে এক বিপ্লব ঘটে গেল— যা ছিল চোরাবাজার তা হয়ে দাঁড়াল খোলাবাজার— আর কোনো রাখঢাক নেই। রাস্তাঘাটে বসে গেল বিকিকিনির হাট, জুয়া খেলার আসর। মাঝেমধ্যে পুলিশি হানা— আমাদের দেশের হল্লাগাড়ি কায়দায় চোর-পুলিশ খেলা।

এখন চলছে উত্তর-পেরেস্ত্রৈকা পর্ব। অবাধ ব্যাবসা-বাণিজ্যে উৎসাহদানের খাতিরে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট এই বছরের ২৯ জানুয়ারি একটি হুকুমনামা জারি করে জাতিকে আরো এক

পদক্ষেপ এগিয়ে দিলেন সভ্যজগতের পথে। হুকুমনামায় বলা হয়েছে: 'এখন থেকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি গাড়ি চলাচলের রাস্তা, পাতাল রেলের সাবওয়ে এবং সরকারি দপ্তরের দালানসংলগ্ন এলাকা বাদে তাদের সুবিধামতো যে-কোনো জায়গায় গাড়িতে করে বা হাতে হাতে জিনিসপত্র ফেরি করতে পারেন। স্থানীয় শাসনসংস্থাগুলিকে এই ব্যাপারে সহায়তাদানের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।....' দ্রব্যমূল্যের ওপর থেকে সরকারি নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দেবার পরও যখন পণ্যদ্রব্যে বাজার ছেয়ে গেল না, কলকারখানা, খামার একের পর এক বন্ধ হয়ে যেতে বা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হতে লাগল, ঘাটতির পরিমাণ যখন আরো বাড়তে লাগল, আর তার ফলে দ্রব্যমূল্য উত্তরোত্তর চড়তে লাগল, তখন সরকার বাজারের পথ প্রশস্ত করার জন্য জারি করল এই নতুন নির্দেশ। এই সঙ্গে রাশিয়ার বাণিজ্যমন্ত্রীর মন্তব্য: 'এই নির্দেশ ঘোষিত হওয়ার পর আমাদের অভিধান থেকে 'ফাটকাবাজ' শব্দটি চিরতরে উঠে গেল। ব্যাবসামাত্রই যে আইনসম্মত ও হিতকর এখন থেকে আমাদের সেটা মেনে নিতে হবে— তা সে ব্যাবসার রূপ যাই হোক না কেন।

নির্দেশ জারি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সরকারি দালানগুলি প্রায় খালি হয়ে গেল, মস্কোর কোনো কোনো অঞ্চল ফেরিওয়ালা ও পসারির ভিড়ে এমন ছেয়ে গেল যে পথচলা দায়। খাদ্যদ্রব্য থেকে শুরু করে জামাকাপড় মনিহারি জিনিস— সবই বিক্রি হচ্ছে রাস্তায়, রাস্তার ওপরই লোকে জামাকাপড়, জুতো মেপে দেখছে, কিনছে। অনেক সময় সরকারি দোকানগুলির সামনেই বিক্রি হচ্ছে সেখান থেকে পাচার করা জিনিস, রিলিফের মাল। আজকাল সরকারি জিনিসের ওপরও দামের কোনো ছাপ মারা থাকে না। এমনকী রাস্তায় খবরের কাগজের ফেরিওয়ালাদেরও স্বাধীনতা আছে যেমন খুশি দাম হাঁকার— কাগজের ওপর লেখাই থাকে 'খুচরো মূল্য যখন যেরকম'।

কিন্তু না, রাস্তার এই বিকিকিনির হাটে মূল্য একেবারে যদৃচ্ছা একথা মনে করা ঠিক হবে না। সরকারের হাত থেকে বাজার চলে গেছে ঠিকই, কিন্তু ক্রেতা ও বিক্রেতা, চাহিদা ও জোগানের নিয়ম এই বাজার নিয়ন্ত্রণ করে না— নিয়ন্ত্রণ করে সংঘবদ্ধ মাফিয়া। তারাই দর বেঁধে দেয়। জিনিস নষ্ট হয়ে গেলেও বিক্রেতার অধিকার নেই দাম কমানোর। মাফিয়ার দৃষ্টি সজাগ। একাধিক বার বাজারে চিনি ও সিগারেট কিনতে গিয়ে সে-অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে। সেদিন একজন রাস্তার দোকানি ৬০ রুবল কিলো দরে চিনি দেবে বলে কথা দিলেও বিক্রি করতে পারল না আমার কাছে। শেষ মুহূর্তে আড়চোখে পাশে তাকিয়ে আমাকে ফিসফিসিয়ে বলল, পারব না, পাশে তাকাতে মস্তান গোছের একজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ব্যাপারটা বুঝতে দেরি হল না। একজন কুড়ি সিগারেট ১৫ রুবলের জায়গায় ১৩,৫০ রুবলে দিতে চাইলে তার হাল আরো খারাপ হল— সেই এলাকা থেকে টেনে বার করে দিল দুই মস্তান। দেখেছি এই বাজারে দরাদরি করার কোনো অর্থ হয় না— দর বাঁধা আছে। মস্তানরা বখরা পায়। পুলিশের বিশেষ কোনো ভূমিকা দেখলাম না।

এ-বাজারে সকলেই যে ফাটকায় নেমেছে তা নয়। সামান্য বেতনে বা পেনশনের টাকায় সংসার চালানো দায়। ব্যাঙ্কে যে জমানো টাকা ছিল তাও নিঃশেষ, তাই অনেকে এখন বাড়িতে সঞ্চিত খাদ্যদ্রব্য, জামাকাপড়, হাঁড়িকুড়িও বিক্রি করছে। এদের অধিকাংশই মাঝবয়সি। চেনা লোকজনের নজর এড়ানোর জন্য বেপাড়ায় যান জিনিসপত্র বেচতে।

খুলে গেল সহজে রোজগারের আরো একটি পন্থা— ভিক্ষাবৃত্তি।

মেত্রোর সাবওয়েতে ঢোকার মুখে দাঁড়িয়ে আছে একজন— মুখে খোঁচা দাড়ি, বুকে প্ল্যাকার্ড সাঁটা: স্তালিনের দমননীতির শিকার। আমার জামার আস্তিনে টান মেরে সে-দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সাহায্যপ্রার্থী। লোকের সহানুভূতি আদায় করে আর্থিক সাহায্যপ্রার্থনার এও এক উপায়।

২০ জুন, ১৯৯২ অবাধ বাণিজ্যের কল্যাণে গোটা শহরটা যখন খোলা মার্কেটে পরিণত হওয়ার অবস্থা, বাজারের ভিড় আর আবর্জনাস্তূপের ফলে স্থানীয় অধিবাসীদের অবস্থা যখন প্রাণান্তকর হয়ে উঠল তখন পুরসভা সরকারি নির্দেশ খানিকটা সংশোধন করল— শহরের কেন্দ্রস্থলের ছয়টি বড়ো রাস্তায় কেনা-বেচা করা যাবে না। কিন্তু জিনিসপত্র বিক্রি করতে ইতিমধ্যেই যে-জনতা পথে নেমেছে তার ভিড়টা যাবে কোথায়? ফলে কেন্দ্রীভূত হল অনুমোদিত এলাকাগুলিতে— সে-সব জায়গায় একমুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকার উপায় নেই— ভিড় আপনাকে ঠেলে নিয়ে যাবে উজানে। আর নিষিদ্ধ জায়গাগুলিতে? সেখানে পসারিদের ভিড় কমলেও একেবারে যায়নি। এবারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হল পুলিশ। ভাগীদার বাড়ল, ফলে জিনিসের দাম আরো বাড়ল। শহরের জঞ্জালও বেড়ে চলল।

ঈশ্বরের ওপর বরাত দিয়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে রাশিয়াকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ১৬ জুন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে বেরিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে ঘনঘন তুমুল করতালিধ্বনিতে অভিনন্দিত হল তাঁর ভাষণ। ইয়েলৎসিন ঘোষণা করলেন: 'পৃথিবী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারে। কমিউনিজমকে আর মাথা তুলে দাঁড়াতে হচ্ছে না।' কিন্তু বলতে ভুলে গেলেন যে তাঁর নিজের দেশে কমিউনিস্টরা রয়েই গেছে। বুশকে যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়ে এলেন, পার্লামেন্টে কমিউনিস্টদের প্রবল বিরোধিতার মুখে পড়ে তার কতদূর কী

শেষ পর্যন্ত পালন করা সম্ভব হবে সে-বিষয়ে সন্দেহ থেকেই গেল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তিনি জয় করলেন, কিন্তু নিজের দেশকে এখনও তিনি বশে আনতে পারেননি। ফিরে এসে তিনি কী দেখতে পেলেন? মাত্র কয়েক দিনের অনুপস্থিতি— কিন্তু এরই মধ্যে দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি জটিলতার আকার ধারণ করেছে। মল্‌দোভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ স্লাভ জনগোষ্ঠীর সার্বভৌমত্বের সংগ্রামকে কেন্দ্র করে গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে রাশিয়া। জর্জিয়ার সঙ্গেও যুদ্ধপরিস্থিতি দেখা দিয়েছে রাশিয়ার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বের হাত মেলানোর অতিরিক্ত উৎসাহে একের পর এক যে সমস্ত ঘোষণা তিনি সেখানে করলেন দেশের মাটিতে কমিউনিস্ট, দেশপ্রেমী ও জাতীয়তাবাদী— সকলের কাছেই সেগুলি 'বিশ্বাসঘাতকতা' আখ্যা পেল।

'সাংকত্ পেতের্বুর্গ ও মস্কোর টেলিভিশন কেন্দ্রের সামনে, প্যালেস স্কোয়ার আর রেড স্কোয়ারে সরকারি নীতির বিরুদ্ধে নিত্য বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে লক্ষ লক্ষ মানুষ— কমিউনিস্ট, অ-কমিউনিস্ট, কমিউনিস্টবিরোধী ও জাতীয়তাবাদীদের ভেদাভেদ লোপ পেয়েছে সেখানে। স্বাধীন বাজার ব্যবস্থা চালু হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য ও পণ্যসামগ্রীর দাম ক্রমাগত এমনই ঊর্ধ্বগামী হয়ে চলেছে যে লোকের মাইনে তার ধারে কাছে যেতে পারছে না। ফলে বহু মানুষেরই খাবার এবং অন্যান্য কিছু কিছু জিনিস কেনার অভ্যাস পালটাতে হচ্ছে। সীমিত হয়ে পড়ছে মানুষের চলাফেরার অভ্যাসও। গত বছরের ১ এপ্রিল সরকারি পরিবহনের ভাড়া ৫ কোপেক থেকে বেড়ে হয়েছিল ১৫, জানুয়ারিতে ৫০ কিন্তু গত ২৪ জুন আগে থেকে কোনো ঘোষণা ছাড়াই রাতারাতি বেড়ে হয়ে গেল ১ রুবল। এক বছরে ২০ গুণ বৃদ্ধি। আকাশছোঁয়া দামের ফলে দুধ ও চিনির মতো দুষ্প্রাপ্য বস্তু বাজারে পাওয়া অবশ্য অনেকটা সহজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত ছয় মাসের মধ্যে বাজারে জিনিসের দাম বেড়েছে ১০৩ শতাংশ, অথচ লোকের গড়পড়তা বেতন বেড়েছে ৭৮ শতাংশ। ইয়েলৎসিন যখন অর্থনৈতিক সংস্কার শুরু করেন তখন জনসাধারণের গড়পড়তা মাসিক বেতন ছিল ৯০০ রুবল, এখন বেড়ে হয়েছে ১৯৫০ রুবল। সবচেয়ে বেশি বেড়েছে চিনির দাম। বাজারে নিয়মিত চিনি আসতে শুরু করে মাত্র জুন মাস থেকে। ইয়েলৎসিনের সংস্কারের আগে এক কিলোগ্রাম চিনির দাম ছিল ২.৪০ রুবল। এখন তার ন্যূনতম দাম ৬৮ রুবল। ২ জানুয়ারির আগে এক পাউন্ডের একটা রুটির দাম ছিল ৬০ কোপেক— এত সস্তা যে গর্বাচ্যোভ একবার অভিযোগ করেছিলেন যে রুটি দিয়ে ছেলেরা ফুটবল খেলছে। সে নয়নাভিরাম দৃশ্য অবশ্য আমার দেখার সুযোগ কোনো দিন হয়নি, তবে এক বছর আগেও রুটির দাম যখন ১৮ কোপেক ছিল তখন টুকরো টুকরো করে গুঁড়িয়ে পায়রাদের খাইয়ে অনেককে তৃপ্তি পেতে দেখেছি, শুনেছি গ্রামদেশে পশুখাদ্যের অভাবে বস্তা বস্তা কিনে শুয়োরকেও খাওয়ানো হত।

দুধ আর মাখনের দামও অবিশ্বাস্যরকম চড়ে গেছে জানুয়ারির পর থেকে। শীতের সময় মস্কোবাসীদের অনেকেই ঘরে ছানা তৈরি করে তাই দিয়ে মাংসের অভাব মেটাত ইদানীং। তার ফলে দুধ অনেক সময় দুপুরের পর অনেক দোকানে পাওয়া যেত না। সাধারণ রুশিদের বেতনের প্রায় ১০ শতাংশ চলে যায় খাদ্যদ্রব্যের পেছনে। বাজারে সবচেয়ে বেশি যে-জিনিসের দাম বেড়েছে তা হল বাচ্চাদের জুতো। সরকার থেকে ভরতুকি দিয়ে যা বিক্রি হত ১৫ রুবলে, এখন তা বৃদ্ধি পেয়েছে ৪.২৩০ শতাংশ। জামাকাপড় লোকের এখনও চলছে পুরোনো সঞ্চয় থেকে। এদেশে ফ্যাশন পুরোনো হতে আগে দেরি হত, এখন আর দেরি হয় না। তবে সবচেয়ে তাড়াতাড়ি যে-জিনিসটার ক্ষয় হয় নজরটা নীচে নামিয়ে সেদিকে লক্ষ করলে মানুষের দুর্দশা বুঝতে অসুবিধা হয় না। নতুন জুতো কেনা অধিকাংশেরই সাধ্যের বাইরে। কোনো ঘোরালো পরিস্থিতি প্রসঙ্গে রুশিদের মধ্যে আগে ঠাট্টার ছলে একটা কথা প্রচলিত ছিল— বোতল নিয়ে না বসলে বোঝা যাবে না। এখন তারা বলাবলি করছে বোতল নিয়ে বসেও বোঝার সাধ্য নেই। দুধ আর রুটি ছাড়া যে স্বল্প কয়েকটি জিনিস রাশিয়ার প্রধান খাদ্যের তালিকায় পড়ত তাদের মধ্যে ভোদ্‌কাও ছিল। জানুয়ারিতে ইয়েল্‌ৎসিন সরকার দ্রব্যমূল্য থেকে নিয়ন্ত্রণ উঠিয়ে দিলেও ভোদ্‌কা তখনও সরকারি ভরতুকি দিয়ে কম দামে দোকানে বিক্রি করা হত— ১৫ আউন্সের বোতলের দাম ৪৭ রুবল, যদিও কার্যত বিক্রি হত খোলা বাজারে— ১২০ রুবল দামে। ১ জুন থেকে দুধ এবং রুটির সঙ্গে সঙ্গে ভোদ্‌কার ওপর থেকে মূল্যনিয়ন্ত্রণ উঠিয়ে দেওয়ামাত্র দাম উঠে গেল ১৬০-এ। রুশিদের কথা, ভোদ্‌কার দাম ১৬০ কেন, ৫০০ রুবল হলেও তারা খাবে। স্থানীয় একটা চুটকি এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল। পেরেস্ত্রৈকার প্রথম দিককার কথা। গর্বাচ্যোভ্ একবার এক কারখানা-শ্রমিককে প্রশ্ন করেন এক-বোতল ভোদ্‌কার দাম ২০ রুবল হলে সে ভোদ্‌কা খাবে কিনা। উত্তর: 'অবশ্যই খাব।' 'যদি ৬০ হয়?' 'খাব'। '১০০ হলে?'— 'তাও খাব'। '১৫০ হলে?' 'না, খাব না?'— 'কেন?' 'কেননা আমার মাইনে ১০০-র বেশি নয়'— শ্রমিকের উত্তর। সেই ভোদ্‌কার একচেটিয়া কারবার সরকারের হাতে থাকায় তা থেকে মোটা লাভের অঙ্ক সরকারের তহবিলে আসত। এখনও সরকারের হাতে আছে, তবু তা তার একচেটিয়া অধিকারে আছে এমন কথা বলা যায় না। বিদেশি ভোদ্‌কা বাজারে ছেয়ে গেছে। ফ্রান্সের রাস্‌পুতিনের পাশে দিব্যি শোভা

পাচ্ছে জার্মানির গর্বচ্যোভ্— অবশ্য শোনা যায় সেরা জার্মান গর্বচ্যোভের সম্মানে এই ব্র্যান্ড নয়— ইনি নাকি জারের আমলের কোনো এক জেনারেল গর্বাচ্যোভ্। আছে মার্কিন দেশে তৈরি স্মিরনফ ব্র্যান্ড ভোদ্‌কা। শুনেছিলাম নেপোলিয়ানকে যিনি তাঁর রণকৌশলে রুশ দেশ ছাড়তে বাধ্য করেছিলেন সেই রুশ সেনানায়ক কুতুজভের সম্মানে ফরাসি দেশে প্রচলিত নেপোলিয়ান ব্র্যান্ড অনুকরণে রাশিয়া কুতুজভ্ ব্র্যান্ডি বাজারে ছাড়বে। নেপোলিয়ান ব্র্যান্ডির অভাব বাজারে নেই, কিন্তু কুতুজভ্ ব্র্যান্ডি দেখতে পাচ্ছি না। রুশি ভোদ্‌কার তুলনায় এগুলির দাম সামান্য বেশি। কিন্তু আরো সস্তায় অর্ধেক দামে পাওয়া যায় বেলজিয়াম অ্যালকোহল— এক লিটারের বোতল ৪০ রুবল। অর্ধেক জল মেশালেই খাঁটি ভোদ্‌কা— ১০০ রুবলও পড়ছে না একবোতল ভোদ্‌কা। রুশিরা কোণঠাসা হয়ে পড়ছে, কিন্তু টনক নড়ছে না।

পরিবর্তনের শিকার

এপ্রিল, ১৯৯২। এই যুগ পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া একেক জনের ক্ষেত্রে একেক রকম, তবে অধিকাংশের পক্ষেই দুঃসহ, নেতিবাচক। পোল্যান্ড সীমাতে রাশিয়ার দুর্গনগরী ব্রেস্ত্-এর ঘটনা। দ্বিতীয় বিশ্বযুধের সময় ব্রেস্ত্-দুর্গের মুষ্টিমেয় কয়েকজন সৈনিক সীমান্ত রক্ষার জন্য আপ্রাণ লড়াই করে প্রবাদ-পুরুষে পরিণত হয়েছিলেন। ব্রেস্ত্-কেল্লার রক্ষক বীর সৈনিকদের মধ্য যাঁরা বেঁচে গিয়েছিলেন তাঁদরই একজন তিমিরগেন জিনাত। ব্রেস্তে বেড়াতে এসেছিলেন ১৯৯২-এ সেপ্টেম্বরে। অনেকক্ষণ হাঁটলেন ফাঁকা দুর্গের ভেতরে, ব্রেস্তের রাস্তায় রাস্তায়। তারপর আত্মহত্যা করলেন চলন্ত ট্রেনের চাকার তলায় মাথা পেতে দিয়ে।'তখনও যুদ্ধের সময় যে আঘাত পেয়েছিলাম তাতে যদি আমার মৃত্যু হত তা হলে অন্তত জানতে পারতাম জন্মভূমির জন্য প্রাণ দিয়েছি।'' চিরকুটে এই কথাগুলি তিনি লিখে যান। তিনি তাঁর মৃত্যুকে বিশাল দেশের ভাঙনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বলে সকলকে জানাতে বলেন।

গর্বাচ্যোভের পেরেস্ত্রৈকা ইয়েল্‌ৎসিনের সংস্কারনীতিতে রূপান্তরিত হওয়ার আগে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ইয়েল্‌ৎসিন ঘোষণা করেছিলেন দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি ঘটলে তিনি রেলের চাকার তলায় প্রাণ দেবেন। কিন্তু প্রাণ দিলেন অন্যেরা— সমস্ত কিছুর ওপর আস্থা হারিয়ে, আত্মবিশ্বাস হারিয়ে।

এই সময় থেকেই শুরু হল রুবলের দ্রুত অধোগতি। সর্বত্র তৃতীয় শ্রেণির বিদেশি জিনিসের ছড়াছড়ি। কোনো জিনিসের কোনো গ্যারান্টি নেই, যেমন গ্যারান্টি নেই দেশের মুদ্রার। ভবিষ্যতের একমাত্র গ্যারান্টি ডলার।

১৯৯৩ সালের মার্চ মাসের কোনো এক সময়ের ঘটনা: মস্কোর বেলারুস স্টেশনে রেলের কামরা থেকে ছোটোখাটো সুটকেস হাতে নামলেন গ্রেট ব্রিটেনের মিলিটারি attache। টুর সেরে ফিরছেন। সঙ্গে সঙ্গে কুলি ছিনিয়ে নিল তাঁর হাতের সুটকেস। বয়ে নিয়ে চলল প্রতীক্ষমান মোটরগাড়ির কাছে। ইংরেজ ভদ্রলোকটি কুলির সাগ্রহ দৃষ্টির সামনে মানিব্যাগ খুললেন। কিন্তু হা ভগবান! এ কী! কোথায় ডলার পাউন্ড? মানিব্যাগ খুলে কুলির হাতে ধরিয়ে দিতে গেলেন একশো রুবলের একখানা নোট। তখন অবশ্য ১ ডলার ৮০০ রুবলের সমান। কুলি সেই নোট ঘৃণাভরে ফেলে দিয়ে ভদ্রলোকের গায়ে থুতু ছিটিয়ে স্থান ত্যাগ করল।... পরে দূতাবাস থেকে স্টেশন মাস্টারের কাছে অভিযোগ করা হয়। তবে কোনো ফল পাওয়া যায়নি। স্টেশন মাস্টারের জবাব: 'থুতু অনেকেই ছিটোয়।...' তা ঠিক, কিন্তু সে থুতু তো নিজের গায়েই এসে পড়ছে! এ বোধ আজ আর অনেকের নেই!

মস্কোয় কী না বিক্রি হচ্ছে? লেনিন স্মৃতিসৌধের মুখোমুখি জ্বলজ্বল করছে ফরাসি বিজনেস হাউজ লাফাইয়েতের বিজ্ঞাপন। সর্বত্র প্রাইভেট ব্যাঙ্ক, যৌথ উদ্যোগ, জয়েন্ট স্টক কোম্পানি, বার, জুয়াখেলার ঘর। কবি আলেক্সান্দ্র ব্লোকের নামে Casino হয়েছে। চ্যেখভ্ স্ট্রিটে Cherry Orchard একটা ব্যাঙ্কের নাম। সোভিয়েত আমলে হলে বলা যেত ধৃষ্টতা। কিন্তু আজ শিল্প সংস্কৃতি সবই পণ্যসামগ্রী।

মেট্রোর সাবওয়েতে টুপি হাতে বসে আছেন এক বৃদ্ধ, বুকে শোভা পাচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পদক— এক সময় বুক দিয়ে রক্ষা করেছিলেন দেশকে। টুপিতে পড়ে আছে মাত্র কয়েকটা রুবল— একটা রুটি কেনার পক্ষেও যথেষ্ট নয়। বৃদ্ধের গাল বয়ে বড়ো বড়ো ফোঁটায় গড়িয়ে পড়ছে চোখের জল। কিন্তু রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের তা চোখে পড়ে না। তা ছাড়া ওই চোখের জলে ভোলার পাত্রও তিনি নন।

থেমে গেল সোভিয়েত আমলের ঘড়ি

মস্কো, ৪ জুলাই, ১৯৯২। মস্কো শহরে কেন্দ্রে এককালের দ্‌জের্‌জিন্‌স্কি স্কোয়ার। একপাশে কে জি বি-র সদর দপ্তর ও স্কোয়ারের মাঝখানে কে জি বি-র প্রতিষ্ঠাতা লৌহমানব দ্‌জের্‌জিন্‌স্কির মূর্তির জায়গায় পড়ে আছে শূন্য বেদিটা। মূর্তির স্থান হয়েছে মিউজিয়ামে।

সোভিয়েত আমলের সেই কড়াকড়ি রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আর নেই। স্কোয়ারের আরেক দিকে ইউরোপের অন্যতম বৃহৎ শিশু বিপণি 'দিয়েত্‌স্কি মির' (শিশু ভুবন)-এর পাঁচতলা দালান। জানুয়ারির শেষে রাস্তায় কেনা-বেচা আইনসিদ্ধ বলে ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অবাধ বাণিজ্যনীতির কল্যাণে বিপণির

চারধারটা সমাজবিরোধীদের একটা বিপজ্জনক ঘাঁটি হয়ে উঠেছিল। দোকানের ভেতরে অনেক কাল হল ন্যায্যমূল্যে কোনো শিশুপণ্যসামগ্রী পাওয়া যেত না। এর পর প্রকাশ্যে দোকানের বাইরেই চলতে লাগল কয়েক গুণ বেশি দামে দোকান থেকে পাচার করা জিনিসের কেনা-বেচা। খেলার বন্দুক, সাইকেল, জুতো-জামা থেকে শুরু করে অন্যান্য জায়গা থেকে আমদানি করা ভোদ্‌কা ও অন্যান্য মাদকদ্রব্য, সত্যিকার বন্দুক-পিস্তল— কীই না-বিক্রি হতে লাগল সেই বাজারে! চুনোপুঁটি, গাঁটকাটা, পকেটমার, মাফিয়া, বারবণিতা, সমকামী, বেশ্যার দালাল, সশস্ত্র মস্তান— কে না-থাকত সেই ভিড়ের মধ্যে! কয়েক মাস এই দৌরাত্ম্য চলার পর দোকানের কর্মচারী এবং জনসাধারণের প্রতিবাদের ফলে পুরসভা ওই এলাকায় অবাধ বাণিজ্য বন্ধ করে দিতে বাধ্য হল। এবারে দোকানের চারধারে বিকিকিনি নেই, কিন্তু দোকানের ভেতরেও কিছু নেই। পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যে এই প্রথম বন্ধ হয়ে গেল দোকানের একতলায় হলঘরের বিশাল ঘড়িটা। শিশুদের জিনিসের জায়গায় সেখানে আয়োজিত হচ্ছে অটোমোবাইল শো। ঢেলে সাজানো হচ্ছে দোকানটা— বিভিন্ন বাণিজ্যসংস্থাকে ভাড়া বা ইজারা দেওয়া হবে ভাগ ভাগ করে। শিশুরা আর সুবিধাভোগী শ্রেণি হিসাবে এদেশে গণ্য নয়। তাদের খেলনার কথা বাদই দিলাম— জামাকাপড় এবং অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের দাম মাসে মাসে বেড়ে চলেছে, বাড়তে বাড়তে আকাশছোঁয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। এককালে অভিভাবকদের সমস্যা ছিল— শিশুরা বড়ো বেশি আবদার করে— 'চাই, কিনে দাও'। দাম জিজ্ঞেস করার কোনো বালাই নেই। এখন তারা গুনতে শিখেছে— ছোটো ক্লাসের অঙ্ক তারা শিখছে রাস্তায় পাতাল রেলের সাবওয়েতে ছোটোখাটো জিনিসপত্র বিক্রি করে। অভিভাবকদের জিত হয়েছে, কিন্তু কী মূল্যে? গত পাঁচ বছরে রাশিয়ায় জন্মহার ৩০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। শিশুজন্মের হার কমে যাওয়ায় দোকানে নবজাতকদের জন্য জামাকাপড়ের চাহিদাও হ্রাস পেয়েছে, কিন্তু দাম তাই বলে এতটুকু কমেনি। পেতের্বুর্গে হাজারে সদ্যোজাত শিশুর মৃত্যুর হার সতেরো জন— ইউরোপের গড়পড়তা সূচকের তিন গুণ বেশি। গরমের ছুটি শুরু হয়েছে। আগে এই সময় শহরের বাস রিজার্ভ করে দলে দলে ছেলে-মেয়েরা পাইওনিয়র পতাকা তুলে ছুটি কাটাতে যেত শহরের বাইরে অথবা সমুদ্রের ধারে কোনো ক্যাম্পে। অভিভাবকদের তখন সমস্যা ছিল— ক্যাম্পে আদৌ পাঠাবেন কি না। এখন সমস্যা অন্য— অত টাকা কোথায়? দেশের প্রায় চল্লিশ লক্ষ শিশু গ্রীষ্মকালীন ক্যাম্পে যেতে পারছে না এ বছর। নহাজারের বেশি ক্যাম্প বন্ধ হয়ে যাচ্ছে অর্থাভাবে। হলিডে ক্যাম্প-এর তিন সপ্তাহের জন্য একটি ভাউচারের পেছনে খরচ পাঁচ থেকে আট হাজার রুবল। ১৯৯২ সালে দেশে মুদ্রাস্ফীতি এতটাই বেড়ে গিয়েছে যে ১ ডলার ১২০ রুবলের সমান দাঁড়িয়েছে, যেখানে সোভিয়েত আমলে সরকারি হিসাবে ১ ডলার ছিল ৬৪ কোপেকের সমান। হলিডে ক্যাম্পে যা খরচ লাগে সেই অঙ্কের ৮০ শতাংশ ট্রেড ইউনিয়ন এবং সোশ্যাল ইনশুরেন্স যদি দিতেও পারে তবু অভিভাবককে দিতে হবে অন্তত ৫০০ রুবল। মস্কোর আশেপাশের পাঁচশো ষাটটি ক্যাম্পের মধ্যে অন্তত একশোটি উঠে যাচ্ছে এই গ্রীষ্মে। ওই একই কারণে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ছেলে-মেয়েদের গ্রন্থাগার, চক্র আর ক্লাসগুলি। শহরের পার্কগুলিতে শিশুদের জন্য যেসমস্ত বন্দোবস্ত আছে, ছুটির সময় একদিনেই মাথা পিছু তার পিছনে খরচ হয়ে যাবে ৪০-৫০ রুবল। সেগুলি উপভোগ করতে গেলে অভিভাবকদের বোঝা কমাতে এবারেও তাঁদের দলে দলে দাঁড়াতে হবে পথে দুধের খালি প্যাকেটকে ভিক্ষাপাত্র করে। থেমে গেছে পুরোনো দিনের ঘড়ি।

নিবেদন

এই পত্রিকায় প্রকাশিত চিঠিপত্রে পত্রলেখকদের মতামতের জন্য সম্পাদকমণ্ডলীর কোনো দায় নেই, বলা বাহুল্য। এই সঙ্গে বলা যায়, আমরা পাঠকের মতামতকে খুবই গুরুত্ব দিই। পাঠকরা নির্দ্বিধায় তাঁদের মতামত জানাবেন, এই আমাদের বিনীত প্রত্যাশা।

—সম্পাদক

অর্থনীতির নয়, ভগবানের ভরসায় ছেড়ে দেওয়া বাজেট

অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়

গত বছর নভেম্বর মাসে সরকারের তরফ থেকে ২০১৯-২০-র দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের আনুমানিক তথ্য প্রকাশিত হলে দেখা যায় যে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার কমে হয়েছে ৪.৫ শতাংশ। গত বছরের ইকোনমিক সার্ভে প্রকাশিত তথ্যও দেখাচ্ছে যে ভারতের অর্থব্যবস্থার বৃদ্ধির হার ক্রমশ নিম্নগামী।

সার্বিক অবস্থা বিচার করে বহু অর্থনীতিবিদ এই আর্থিক মন্দার মুখ্য কারণ হিসেবে অর্থব্যবস্থায় চাহিদার ঘাটতিকে দায়ী করছেন গত বছর থেকেই। এই অবস্থায় যখন ভারতের অর্থমন্ত্রী সংসদে কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট পেশ করতে যাচ্ছিলেন অনেকেই আশা করেছিল যে এই চাহিদার ঘাটতির সমাধান হিসেবে বেশ কিছু প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কিন্তু সেই সব আশায় ছাই দিয়ে এই বছরের বাজেটে প্রায় কিছুই পাওয়া গেল না। বর্তমান সরকারকে প্রায় গোটা গত বছর ধরে আর্থিক মন্দার অস্তিত্বকেই মানতে নারাজ হিসেবে দেখা গিয়েছিল। অনেক অর্থনীতিবিদ যখন বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে ভারতের জিডিপি-র পরিসংখ্যান নিয়ে প্রভূত সন্দেহ প্রকাশ করে চলেছেন, এঁদের বক্তব্য অনুযায়ী ভারতের জিডিপি-র পরিসংখ্যান বর্তমান পদ্ধতি অনুযায়ী অনেকটা বেশি অনুমান করা হচ্ছে।

কেন্দ্র সরকার এই সমস্ত সন্দেহ নাকচ করে চলেছে অনেক দিন ধরেই, কিন্তু এবারে যখন কেন্দ্র সরকারের নিজের তথ্য অনুযায়ীই বৃদ্ধির হার লাগাতার ছয় ত্রৈমাসিক ধরে কমেছে তখন এই আর্থিক মন্দা অস্বীকার করার আর কোনো জায়গাই থাকেনি।

ইকোনমিক সার্ভের পরিসংখ্যান অনুযায়ী জাতীয় আয়ের হার ২০১৬-১৭ থেকে কমে চলেছে। সবচেয়ে চিন্তার বিষয় মাথা পিছু জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি ২০১৯-২০-তে এসে ৪.৩ শতাংশ হয়েছে যা ২০১৩-১৪ সালে এই সরকার যখন ক্ষমতায় আসে সেই ৪.৬ শতাংশ-এরও কম।

কাজেই এটা আশ্চর্যের বিষয় নয় যে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা তীব্র ভাবে কমেছে বিগত কয়েক বছরে। ফলে উৎপাদনের বৃদ্ধির হার কমেছে, জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি কমেছে এবং অর্থব্যবস্থা এক সার্বিক সংকটের মধ্যে চলে গেছে।

ইকোনমিক সার্ভে দেখে যদিও বোঝা গেছিল যে বাজেটের ওপর খুব বেশি আশা রাখাটাও ঠিক হবে না। দেশ যখন আর্থিক সংকটের মধ্যে দিয়ে চলেছে তখন এবারের সার্ভের বৃহদাংশ ধনরাশির আহরণ নিয়ে আলোচনায় ব্যয় করা হয়েছে। যে ব্যক্তিসকল বা পুঁজিপতিরা বিশাল ধনরাশির পাহাড়ের ওপর বসে রয়েছেন তাঁরা কীভাবে দেশে আর্থিক বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে সহায়তা করছেন— সেই নিয়ে পাতার পর পাতা লেখা হয়েছে এই সার্ভেতে।

এদিকে বাস্তব হল— কর্মসংস্থান বৃদ্ধিও আনুপাতিক হারে কমেছে বিগত কয়েক বছর ধরে। গত দুই বছরে গ্রামীণ এলাকায় বেকারত্ব অনেক বেশি বেড়েছে শহরাঞ্চলের তুলনায়। অন্য দিকে দেশের বৃহত্তম ধনী ব্যক্তি ও পরিবারদের বার্ষিক আয় গত দুই দশকে চক্রবৃদ্ধি হারে বেড়েছে, তাতে সাধারণ মানুষের আয় বা কর্মসংস্থানের খুব একটা হেরফের ঘটেনি।

এবারের বাজেটে এই আর্থিক মন্দার পরিস্থিতির সমাধানের একমাত্র উপায় ছিল সরকারি কোষাগার থেকে প্রত্যক্ষ ভাবে অর্থব্যবস্থায় অর্থের জোগান। মন্দার সময়ে শিল্পক্ষেত্রে পুঁজি বিনিয়োগ করার দরকার ছিল সরকারের পক্ষ থেকে, কিন্তু শিল্পের জন্য সেই ভাবে কোনো বরাদ্দ দেখা গেল না— আগামী পাঁচ বছরে পরিকাঠামোতে ১০০ লাখ কোটি টাকার কথা ছাড়া। এই ১০০ লাখ কোটি টাকার ইনফ্রাস্ট্রাকচারে বরাদ্দের কথাও গত বছর থেকে শোনা যাচ্ছে সরকারি নানা দলিল দস্তাবেজে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোন অর্থরাশি কোন প্রকল্পে ব্যয় করা হয়েছে— তা এখনও জানা যাচ্ছে না। প্রতিবারই কুমিরছানা দেখানোর মতো এই ১০০ লাখ কোটি বিনিয়োগের কথা শোনানো হচ্ছে গত বছর স্বাধীনতা দিবসের পর থেকেই, অথচ এই টাকা আদৌ কোথাও দেওয়া হয়েছে কি না, দিলে সেখান থেকে কত কর্মসংস্থান হয়েছে, সেই সব প্রকল্পের

বাস্তবায়নের কী অবস্থা— এসব বিষয়ে কোনো উত্তর বা পরিসংখ্যান পাওয়া যাচ্ছে না।

কৃষিক্ষেত্রে এই বাজেট আবার ২০২২ সালের মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার কথা বলল। অর্থমন্ত্রীর বাজেট ভাষণে সৌর বিদ্যুৎ, কৃষিক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক দামের ব্যবস্থা, কৃষিপণ্যের বাজারের সংস্কার, নতুন প্রযুক্তি ইত্যাদি নানা ভালো ভালো কথা বলা হল, অথচ বরাদ্দের খাতায় খুব বেশি কিছু যোগ হল না। কৃষি বিভাগ ও গবেষণা বিভাগের বরাদ্দে কেবল মাত্র ৩.০ শতাংশ ও ৩.৫ শতাংশ বৃদ্ধি ঘটেছে। যদি বিশদে দেখা যায় বরাদ্দের নানা অংশ তা হলে দেখা যাবে কৃষি পরিকাঠামো তৈরি বা উন্নয়নে নামমাত্র অর্থরাশি বরাদ্দ হয়েছে। কীভাবে কৃষকের আয় আর বছর দুয়েকের মধ্যে দ্বিগুণ হবে এই প্রশ্ন করাটাই একটা বাতুলতা।

আর্থিক মন্দার সময়ে সমাজকল্যাণ খাতে খরচ বাড়ানো আর একটা উপায় ছিল মানুষের হাতে খুব তাড়াতাড়ি ক্রয়ক্ষমতা তুলে দেওয়া। বাজেট ভাষণে ৬৯ হাজার কোটি টাকার বরাদ্দও বেশ ফলাও করে বলা হয়েছে। সেখানেও যদি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের বরাদ্দ দেখা হয় তা হলে মাত্র ৩.৮ শতাংশ বৃদ্ধিই দেখতে পাওয়া যাবে— গত বছরের বাজেটের তুলনায়।

ঢাকঢোল পিটিয়ে 'আয়ুষ্মান ভারত' প্রকল্প চালু করা হয়েছিল ২০১৮-তে, বলা হয়েছিল নতুন-পুরোনো মিলিয়ে ১৫০,০০০ স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি করা হবে যেখানে মৌলিক স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়া হবে। বলা হয়েছিল 'প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা'-র সুবিধা দেওয়া হবে বেশির ভাগ সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে। বাজেট ভাষণ অনুযায়ী, এখনও পর্যন্ত এই যোজনার সুবিধা ২০ হাজার মতো হাসপাতালেই পাওয়া যাচ্ছে গোটা দেশে। এই খাতে আরো বেশি খরচ করলে সঙ্গে সঙ্গে অনেক কর্মসংস্থানের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের জন্যে খরচ কমানো যেত, পরোক্ষ ভাবে অনেক সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতাও বাড়ত। কিন্তু বরাদ্দ সেই ভাবে বাড়ল না।

শিক্ষাক্ষেত্রে বরাদ্দের অবস্থাও তথৈবচ। স্কুলশিক্ষা খাতে বরাদ্দ বেড়েছে ৫.৯ শতাংশ আর উচ্চশিক্ষায় আরো কম ৩.০ শতাংশ। এই সরকার প্রথম পাঁচ বছরে প্রচারে অনেক টাকা খরচ করে অনেক প্রকল্পের উদ্বোধন করে, 'স্কিল ইন্ডিয়া' তার অন্যতম— বলা হয়েছিল সম্ভাব্য শ্রমিকদের দক্ষতা অনেক গুণ বাড়িয়ে দেবে এই প্রকল্প। বাস্তবায়নের খাতায় যদিও অনেক শূন্যই জমা হয়েছে, প্রচারে পয়সা খরচ হয়েছে, তার কোনো ফলাফল চোখে পড়েনি।

গ্রামীণ ভারতে ক্রয়ক্ষমতা হ্রাসের হার শহরের চেয়ে অনেক দ্রুত হয়েছে গত দুই বছর যাবৎ। সংবাদপত্র ভরে গেছে গ্রামাঞ্চলে পাঁচ টাকা প্যাকেট দামের বিস্কুটের মতো সস্তা পণ্যদ্রব্যের চাহিদার ঘাটতির খবরে, কিন্তু যথারীতি সরকারের কোনো হেলদোল নেই। এই বাজেটে সুযোগ ছিল 'মহাত্মা গান্ধি জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি' প্রকল্পে অনেক বেশি বরাদ্দ বাড়িয়ে এই চাহিদার ঘাটতি দূর করার। অথচ আমরা দেখলাম এই প্রকল্পে ৯৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া হল— ২০১৯-২০ তে রিভাইজড এস্টিমেট অনুযায়ী প্রকল্পে গেছিল ৭১ হাজার কোটি টাকা, এই বাজেটে বরাদ্দ করা হল ৬১,৫০০ কোটি টাকা।

গ্রামীণ চাহিদা বজায় রাখার ক্ষেত্রে খাদ্য ভর্তুকির একটা বড়ো ভূমিকা রয়েছে। রেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে দেওয়া খাদ্যপণ্যের বেশির ভাগটাই আসে এই ভর্তুকির জন্য, অবশ্যই সাধারণ মানুষের সাশ্রয় হয় এবং ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে। গতবছর বাজেটে ১.৮ লাখ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছিল এই খাতে, এই বছর বরাদ্দের পরিমাণ ১.১১ লাখ কোটি টাকা— প্রায় ৭০০০০ কোটি টাকা কমিয়ে দেওয়া হল বরাদ্দ।

মধ্যবিত্ত মানুষদের জন্যও এই বাজেটে কিছু নেই বললেই চলে— নতুন আয়করের স্ল্যাবের প্রস্তাব ছাড়া। বাজেট ভাষণে দাবি করা হয়েছে এর ফলে বার্ষিক ১২ লাখ বা তার চেয়ে বেশি উপার্জনকারীদের অনেকটাই কর মকুব হয়ে যাবে। যদি খুব সামান্য হিসেব করেও দেখা যায় তা হলে বোঝা যাবে যে সমস্ত করদাতা সঞ্চয় খুব একটা করেন না এবং ফলে মোট আয়ে নানা রকম আইনি সহজলভ্য অব্যাহতিগুলোর সুযোগ নিতে পারেন না— তাঁদের ক্ষেত্রে কিছু কর মকুব হলেও হতে পারে। কিন্তু যাঁরা সঞ্চয় করেন (বিমা, পেনশন ইত্যাদি খাতে) এবং সেই খাতে কর অব্যাহতি পান তাঁদের কোনো লাভই নেই, উলটে নতুন ব্যবস্থায় ক্ষতি হতে পারে— কারণ নতুন ব্যবস্থায় কোনো কর অব্যাহতি নেই।

অতএব, বাজেট গ্রামীণ ক্ষেত্রের মানুষদের হাতেও কোনো ক্রয়ক্ষমতা দিল না, শহরাঞ্চলের মানুষদেরও কিছু দিল না, কৃষকদের জন্যেও কিছু করল না, আবার মধ্যবিত্তদের জন্যও কিছু করল না— এমনকী পুঁজিপতিদের জন্যও কোনো সুবিধা দিল না যাতে নতুন করে অর্থব্যবস্থায় বিনিয়োগ ঘটে। চাহিদার ঘাটতি এর ফলে বাড়বে বই কমবে না, আগামী দিনে এই আর্থিক সংকট আরো তীব্রতর হয়ে ওঠার প্রভূত সম্ভাবনা তৈরি হল। এর ফলে সাধারণ মানুষের দুর্গতির কোনো শেষ থাকবে না অদূর ভবিষ্যতে সেটা বলাই বাহুল্য। ইতিমধ্যে এই সরকার অর্থনীতি ও অর্থব্যবস্থাকে অক্ষরে অক্ষরে 'ভগবানের ভরসায়' ছেড়ে রেখে দিল।

এক আকাশ রোদ্দুর-শাহিনবাগ

সংযুক্তা চট্টোপাধ্যায়

তোবাটেক সিং-কে দেখে ফেললাম। মুখ গুঁজে পড়ে আছে শাহিনবাগ-এর চল্লিশ ফুট চওড়া রাস্তাটার উপর। ঘেমে নেয়ে উঠেছিলাম ঘুমের মধ্যে। মুখ গুঁজে পড়েছিল যে সে কি সত্যিই তোবাটেক সিং নাকি আমি নিজেই।

লড়াইটা দেখে এসেছিলাম, তাই হয়তো ঘুমের মধ্যে এই স্বপ্নের পদচারণা। কিন্তু ঘুম ভাঙিয়ে জাগিয়ে দিল শাহিনবাগ। তাই প্রতিবাদের নাম যেমন শাহিনবাগ, তেমনি ঘুম ভাঙার নাম জেগে থাকার নামও শাহিনবাগ।

দেখতে দেখতে প্রায় পঞ্চাশ দিন। সকাল সকাল বন্ধুকে সঙ্গে শাহিনবাগের উদ্দেশে রওনা দিলাম। মিন্টো রোড থেকে কতটুকুই বা দূর! একবার বদলে নিলে মেট্রোতে মেরেকেটে মাত্র মিনিট চল্লিশ মধ্যমগ্রাম থেকে শহীদ মিনার ময়দানে আসতে এর থেকে বেশি সময় লাগে। খুঁজে পেতে পুলিশ কর্ডন করা এক পেল্লায় চওড়া রাস্তার সামনে এসে দাঁড়ালাম। পাশ দিয়ে কর্ডন সরিয়ে এক চিলতে হাঁটার রাস্তা। রাস্তাটা প্রধানত নয়ডা বা গাজিয়াবাদ সংযোগকারী পথ। অনেকটা হেঁটে গেলে তবে আসল মঞ্চ।

আর এই যাওয়ার পথটুকু বেশ উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। কত যে লোক চলেছে তার ইয়ত্তা নেই। বেশির ভাগের হাতেই সিএএ আর এনআরসি বিরোধী পোস্টার। কত মহিলা, কত ছাত্র-ছাত্রী। কিছু লোক জায়গায় জায়গায় গোল হয়ে বসে গান গেয়ে চলেছে... যব জুল্‌ম্‌ সিতম্‌ কে কোহরে গারাহ... রুই কি তরহ উর জায়েঙ্গে... হাম দেখেঙ্গে। কোথাও বা দলবদ্ধ স্লোগান-এ শীতেল দুপুর মুখরিত। কোনো দল মেতে রয়েছে পথ নাটকে। অনেক বাচ্চাই চলেছে তেরঙ্গা পাগড়ি আর পোশাকে। প্যারাম্বুলেটরে ছোট্ট শিশুকে নিয়ে মা, কোলে শিশু নিয়ে মা, হাত ধরে শিশুকে নিয়ে মা— সব্বাই চলেছে নিজেদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করার লড়াইয়ে।

আলাপ করার চেষ্টা করলাম একজনের সঙ্গে। নাম তার রুকসানা, কথায় বার্তায় সে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিল কেন তাদের এই প্রতিবাদ। বেশ কয়েকদিন পরে দিল্লি রোদ ঝলমল। টকটকে লাল গাল, আর সুরমা টানা দুটো চোখ প্রতিবাদে দৃঢ়। এই রোদ্দুরের মতোই উজ্জ্বল থাকুক শাহিনবাগ। রাস্তায় যেতে যেতে চোখে পড়ল দুটো লঙ্গর, সর্দারজিরা খাওয়ার দেওয়ার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে। এই লড়াইয়ে তারাও সাথে। রাস্তা জুড়ে দেখলাম ছবি আঁকা। সারা রাত জেগে আঁকা লড়াকু ছবি। এসে পৌঁছলাম মূল জায়গায়। দড়ি দিয়ে গার্ড করে রেখেছে যুবকের দল। সামনে সব মহিলারা বসে আছে। দুপাশে প্রতিবাদীরা বসে আছে, মাঝের রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলাম মূল মঞ্চের বাম দিকে। অশীতিপর বৃদ্ধারা বসে আছেন। শুভেচ্ছা বিনিময় করে হাতগুলো ছুঁয়ে দিলাম। পা দুটো ছুঁয়ে কুর্নিশ জানালাম দেশ মায়েদের। মাথায় ওষ্ঠে স্পর্শ করে তাঁরা এঁকে দিলেন আশীর্বাদ। 'জিতে রহ বেটা।' অনেকদিন পর হারিয়ে যাওয়া ঠাকুমা-দিদার গন্ধগুলো যেন আবার পেলাম। আবেগাপ্লুত হয়ে মনে মনে বললাম... হার না মানা এই লড়াইয়ে আমিও আছি। এসে বসলাম সবার সাথে। মঞ্চে তখন স্লোগান চলছে। ভিড় ক্রমশ বাড়ছে। বোরখার শেষ প্রান্তগুলো ছুঁয়ে যাচ্ছে আমার মুখ। এই মুহূর্তটুকু তো পাশে থাকা নয়, পাশে আমরা চিরকালই আছি। অন্তত সেই শিক্ষা নিয়েই তো আমরা বেড়ে উঠলাম। নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান, বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান। শিশুকাল থেকেই আমরা এই পাশাপাশি চলার গল্পে সামিল।

বেরিয়ে আসলাম বাইরে, দেখি এক বাসস্ট্যান্ড জুড়ে বসেছে অস্থায়ী পাঠাগার। জ্যোতিভাই ফুলে পাঠাগার। ছেলে বুড়োরা সব বই নিয়ে পড়ছে। রাস্তার উপর পড়ে থাকা উঁচু উঁচু পাথরে বসে রোদ পোহাতে পোহাতে পড়ে যাচ্ছে বই। কোথাও কোনো অসহিষ্ণুতা নেই, গোলমাল নেই। গঠনমূলক প্রতিবাদ চলছে। study with protest। সবাই যেন সবার সাহায্যে তৎপর। দেখি ইন্ডিয়া গেটের একটা মডেল বানানো, সেখানে ছোটো বাচ্চারা তেরঙ্গা পোশাকে দাঁড়িয়ে আছে। বিশাল ভারতবর্ষের মানচিত্র একজায়গায় ঝুলছে, জানান দিচ্ছে নো এনআরসি নো সিএএ। একটু এগিয়ে দেখি আখলাখ-এর একটা মডেল বানানো

রয়েছে। রক্তমাখা জামাকাপড় সাক্ষী দিচ্ছে আদিম হিংস্র অসহিষ্ণুতার কারণে খর্ব হওয়া স্বাধীনতার। মিলিত সুরে আজাদির স্লোগানে ভেসে যাচ্ছে পুরো শাহিনবাগ... সেই সুর যা ভারতবর্ষের সীমানা ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়েছে বহুদূরের রাষ্ট্রগুলোতেও।

হ্যাঁ, যা আমাদের জন্মগত অধিকার... যা রবি ঠাকুর বলে গেছেন গানে গানে... সেই আলোয় আলোয় মুক্তি... সেই আজাদি। সেই শব্দ উচ্চারণ করা মাত্রই রোমাঞ্চিত হলাম একসাথে। 'হাম মেহকুম ও কি পাও তালে, ইয়ে ধরতি ধর ধর ধরকেগি... হাম দেখেঙ্গে'... এভাবেই কি শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদে মাটি কাঁপিয়ে দেয় পায়ের তলার আগ্রাসীদের। শাহিনবাগ শেখাল। ফ্যায়েজ রবিঠাকুর সব এক হয়ে যায় এখানে। আমাদের শাহিনবাগ এখানে লড়ে যায় অধিকার কেড়ে নেওয়ার প্রবল দাবিতে। এই অন্ধকার সময়ে... অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো দেখে এলাম। শাহিনবাগ তুমি উজ্জ্বল হয়ে থাকো, রোদ্দুরের মতো, আমাদের চেতনায় থাকো... হাম ভি দেখেঙ্গে।

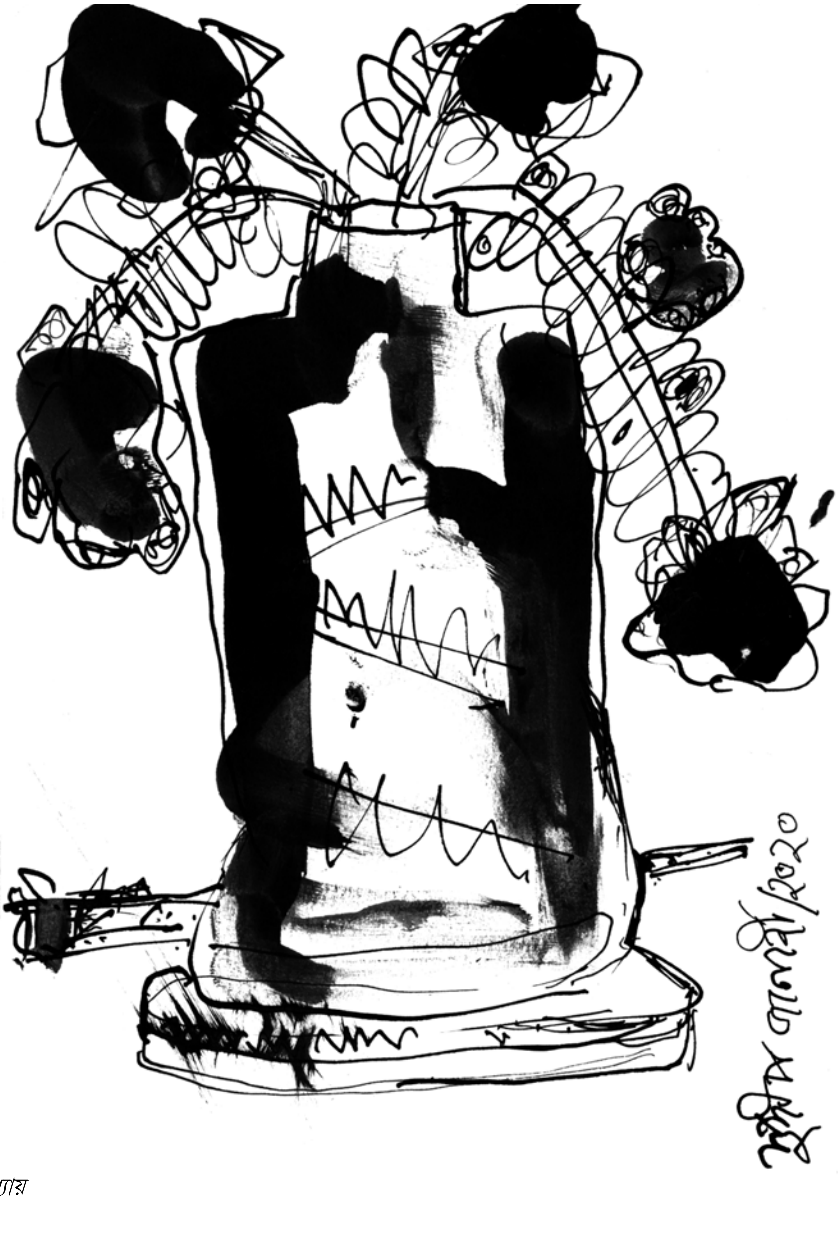

ছবি : সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

অনুশাসন, শাস্তি ও বিশ্ববিদ্যালয়ে হামলা

শ্রীদীপ

বিদ্বেষ ও হিংসাত্মক মনোভাব যখন কোনো সম্প্রদায় আত্মস্থ করে ফেলে, তখন অপরিকরণ প্রণালীটা খুব স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে যায়। খুব সহজেই তখন কল্পিত প্রতিপক্ষ গড়ার কাজে মানুষকে মগ্ন ও আচ্ছন্ন রাখা যায়। ভুলিয়ে দেওয়া যায় অর্থনৈতিক দুরাবস্থা, কর্মহীনতা, স্বাস্থ্য ও উন্নয়নের বেহাল অবস্থা। চাইলেই বুদ্ধিজীবীকে, ছাত্র-ছাত্রীদের, ভিন্নমত-পোষণকারীদের, সংখ্যালঘুকে— সাব্যস্ত করা যায় রাষ্ট্রবিরোধী বা বিভাজনকারী বলে।

সমসত্ত্বার ভিত্তিতে পরিচালিত রাষ্ট্রবাদী রাজনীতিকে চাগিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে অজস্র স্ব-নির্মিত শত্রুর। বিরোধী, সমালোচক, উদারমনস্ক, ধর্মনিরপেক্ষ, মননশীল, যুক্তিবাদী, শরণার্থী— এরা সকলেই হয়ে যায় ‘অপরপক্ষ’ বা ‘প্রতিপক্ষ’ বা ‘রাষ্ট্রবিরোধী’ বা ‘টুকরে-টুকরে গ্যাং’ বা ‘শহুরে-নকশাল’ (এমনকী বলিউড-এর নায়িকাও ছাড় পান না)। সরকার প্রতিনিয়ত বিপুল উদ্দমে কল্পিত শত্রুদমনের কাজে নিযুক্ত করেন সমর্থকদের। অনুশাসন ও শাস্তি-কার্যে, শিক্ষিকা ও ছাত্রীদের পেটাতে পিছপা হন না ‘ভক্তেরা’। মুখোশধারী সশস্ত্র আততায়ীরা রাজধানীর এক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে নির্ঝঞ্ঝাটে। যেমনটা হওয়া খুবই স্বাভাবিক, মতভেদ তীব্র হলে, বা চরম ফি-বৃদ্ধির বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলন ঘনীভূত হলে— দেশে আমরা তেমনটাই হতে দেখিনি কি গত ছবছর? প্রতিদিনকার জীবনে হিংসার কতটা স্বাভাবিকরণ হলে এটা সম্ভব হয়। বিদ্বেষময় দেশ এখন গণপ্রহার, গো-রক্ষার খাতিরে মানব হত্যা, বা ধর্ষকের প্রকাশ্যে দিনের আলোয় এনকাউন্টারে হত্যাকে উজ্জাপনে অভ্যস্ত।

হামলাটি আসলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের শরীরে নয়। মূল লক্ষ এখানে ‘বিশ্ববিদ্যালয়’ নামক চিন্তাধারার উপর। নিশানা এখানে মুক্ত-বিচারধারা। শিকার এখানে সমালোচনা করার সাংবিধানিক অধিকার। তাই বারংবার হাত উঠছে বিবিধতার উপরে। কারণ ভিন্নতার উপর রোলার না চালালে দুরভিসন্ধি সম্পন্ন হওয়ার নয়। বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যানের প্রথা লুপ্ত না করলে, মাল্টিপল-চয়েস প্রশ্নপত্রের সীমাবদ্ধতাকে স্থাপিত করা অসম্ভব।

যাদেরকে ঢোকানো হয়েছিল তাদের হাতে ছিল হাতুড়ি, রড, লাঠি। তিন ঘন্টা ধরে তারা এলোপাথাড়ি আক্রমণ চালায় ছাত্র ও শিক্ষকদের ওপর। অনেকেই আহত হয়। ভিন্নমত-পোষণকারীদের উপর সুপরিকল্পিত আঘাত হানা হবে, তাদের শাস্তি দেওয়া হবে— সেটাকে ক্রমে স্বাভাবিক করে তোলা হচ্ছে! সরকার বা প্রতিষ্ঠানকে প্রশ্ন করলে জুটবে ‘রাষ্ট্র বিরোধী’ তকমা। তাদের শায়েস্তা করার নৈতিক দায়ভার স্বেচ্ছায় বহন করবে কিছু উদ্ধত বর্বর।

আদিম পাশবিক গতিবিধির নজির মোবাইল ক্যামেরায় ধরা পড়ে ঘটনাকালে। আমরা তার সরাসরি সম্প্রসারণও দেখি। কিন্তু ‘পোস্ট-ট্রুথ’ জামানায় যেখানে সত্যিকে ছাপিয়ে যায় জন-আবেগ ও সংবাদমাধ্যম-নির্মিত বিশ্বাস, সেখানে ছবির প্রামাণিক ন্যায্যতা লোপ পায়। আমরা তাই দেখি বা দেখতে চাই, যা বিশ্বাস করি। অধিকাংশ বৈদ্যুতিন সংবাদ মাধ্যম কত সহজেই নৃশংসতার আসল ফুটেজ সরিয়ে দিয়ে দেখাতে থাকে অবান্তর আগেকার কিছু দৃশ্য।

পুলিশ এই নির্মম হাড়-কাঁপানো প্রহার গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ করে। যদিও কিছুদিন আগে রাজধানীর অন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রণ ছাড়াই অনুপ্রবেশ করে গুলি চালাবার নিদর্শন তাঁরা রেখেছেন। এ ক্ষেত্রে বহুবার ডাক পাওয়া সত্ত্বেও তাঁরা কোনো পদক্ষেপ না নেওয়াকেই সমীচীন ঠাওরান। যারা এই ঘৃণ্য ত্রাস ও মর্মান্তিক তাণ্ডব রচনা করল, তারাও দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে, নির্ভয়ে। এক মাস পরেও কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। আসলে, সরকারের সমালোচনা করার স্পর্ধার থেকে তো বড়ো অন্যায় এটা নয় নিশ্চয়।

পুলিশের মতোই বিশ্ববিদ্যালয়-প্রশাসনের অপেক্ষা, উপেক্ষার ও অবজ্ঞার মনোভাব দেখে মনে হচ্ছে যেন এই পরিকল্পিত সন্ত্রাসটি ঘটেইনি। তাঁরা থানায় অভিযোগ নথিভুক্ত করলেন বটে, তবে অন্য ঘটনার জন্য, যার সঙ্গে এ দিনের

হত্যা-প্রয়াসের কোনো সম্পর্কই নেই। অবশ্য যেই মিলিত শক্তি গুন্ডাদের প্রবেশ ও প্রস্থানের পথ সহজ করে দেয়, তিন ঘণ্টা ধরে গণপিটুনি চলতে বা চালাতে দেয়, প্রয়োজনে রাস্তার আলোও নিভিয়ে দেয়, তাদের থেকে সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও নিরপেক্ষ তদন্তের আশা কারা করছেন? ভয় আপনার প্রতি শিরা-উপশিরায়, মস্তিষ্ক ও মজ্জায় বাসা বাঁধুক— সেটাই এখানে কাম্য। প্রতিষ্ঠান ও সরকারের নীতির সমালোচনা করলে, প্রতিবাদে মুখরিত হলে, প্রশ্ন করলে— সংগঠিত বেকার-বাহিনী কারো প্ররোচনা ছাড়াই ছাত্র-শিক্ষক পিটিয়ে গর্ব করবে দেশোদ্ধারের। যেমনটি করছেও স্টিং-অপারেশনে চিহ্নিত এক উনিশ বর্ষীয় আততায়ী তার সহাস্য ও অহংকারী স্বীকারোক্তিতে।

যুক্তি দিয়ে বোঝার প্রয়াস, আহত ছাত্রদের পাশে দাঁড়ানো, সরকারি আখ্যানের প্রতি সন্দেহ পোষণ— সবই দেশদ্রোহিতা। সরকারি আখ্যান আহতকেই দোষী বলে সাব্যস্ত করবে— ক্ষতিগ্রস্তই হয়ে উঠবে উলঙ্ঘনকারী। মিডিয়া-ঘোষণায়। পুলিশ যেই সম্ভাব্য দোষী-তালিকা প্রকাশ করেছে, ও প্রমাণ হিসেবে যেই ছবি পেশ করেছে, সেটি সম্পূর্ণ অন্য কোনো ঘটনার হলেও, মানুষ তা মেনে নেবে নির্দ্বিধায়। ঘটনা এক, ছবি আরেক। বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো নিরাপদ স্থানে প্রাণঘাতী হামলার চাইতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে সার্ভার-রুম বিপন্ন করার কোনো এক পূর্ব প্রয়াস। সে আখ্যান অনুযায়ী সার্ভার-রুম ভাঙচুর হওয়ার দরুনই নাকি আসল আক্রমণের ফুটেজ লোপাট। অথচ এক প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ে ফুটেজ-অনুলিপি ক্লাউড-স্পেস-এ তোলা হয় না কেন?

এই গোটা আগ্রাসন কেবল বুদ্ধি, বিবেচনা, ও বিশ্ববিদ্যালয় বিরোধী নয়। গণতান্ত্রিক ভাবে প্রশ্ন করার মূলে এই আঘাত। যে ফি বৃদ্ধি হলে অধিকাংশ ছাত্রের নাগালের বাইরে চলে যাবে উচ্চশিক্ষা, গরিব খোয়াবে শিক্ষাধিকার— সেই সর্বজনীন দাবির উৎসে এই আক্রমণ। ছাত্র ও শিক্ষক সংগঠনকে উপেক্ষা করে নেওয়া আরোপিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা আড়াই মাস ব্যাপী আন্দোলনের মাথায় এই প্রহার। ভিন্ন মতবাদের শরীরে অভ্যন্তরীণ সার্জিকাল-স্ট্রাইক এই হানা— আক্ষরিক অর্থে স্বৈরতন্ত্রের হাতুড়ি দিয়ে। রাষ্ট্রীয় বলের সামনে রাজধানীর এক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ও ছাত্র সম্প্রদায় কতটা অসহায়, তা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য এই আঘাত।

শাসকের প্রতি নিজেকে সমর্পণ না করলে বশ্যতা কীভাবে চাপিয়ে দেওয়া হবে তার নিদর্শন স্থাপিত হল আরো একবার। বোঝানো হল বিরোধিতাকে চাইলেই নৃশংসভাবে শাস্তি দেওয়া হবে। তার জন্য প্রয়োজনে লাগামছাড়া শক্তিকে কাজে লাগানো যাবে অনায়াসে। আর ঠিক এভাবেই শাসনব্যবস্থা শান দেবে বিদ্বেষ ও ভয় নির্মাণের রাজনৈতিক কৌশলে। নাগরিককে সে মনে করিয়ে দেবে তার আধিপত্য। আপনার আমার রোজকার জীবনে আরো একবার হিংসাকে অস্বাভাবিক থেকে স্বাভাবিক করে তোলা হল। আর মতান্তরের বিধান যদি রাষ্ট্রবাদী মারধর হয়, তা হলে ভাবা দরকার—এ কেমন রাষ্ট্র নির্মিত হচ্ছে!

শরৎ, হেমন্ত, শীত পেরিয়ে বসন্ত আসছে

শুভময় মৈত্র

ঋতুপরিবর্তনে বাংলা। গ্রীষ্ম আর বর্ষা চলে গেছে অনেক দিন, আবার আসতে কিছুটা দেরি। সেই সুযোগে বাকি চার ঋতু নিয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা, যার শেষ বসন্তের আগমনে। সূচনায় বাক্য বর্ধন করে লাভ নেই। উপসংহারও অনুপস্থিত। কারণ বসন্ত শুরু হতে না হতেই শেষ। তারপর দু দুগুণে চার মাসেরও বেশি সময় ধরে ঘামাচি সামলাতে হবে। তাই শুরু করা যাক পুজোর গল্প দিয়েই। তবে এ গল্পে বর্তমান কম, বরং অনেকটাই তিন থেকে চার দশক আগের। তবে প্রৌঢ়ত্বের থেকে যেহেতু ডেঙ্গিত্বের জোর বেশি, তাই সেই জায়গায় হয়তো একালে ফিরতেই হবে এক আধবার। এ লেখার বাদবাকি স্মৃতিচারণ। প্রসঙ্গান্তরের আনাগোনায় জোড়াতাপ্পি খুঁজে পেলে পাঠিকার ভুল নেই কিছু। সে শুধুই লেখকের দুর্বলতা আর এদিনক ওদিক থেকে ভাবনা জুটিয়ে শব্দবৃদ্ধির ব্যর্থ প্রচেষ্টা। সবশেষে যেটা মনে করানোর, এ লেখার কোনো স্বত্ব নেই। কারণ এর পুরোটাই আমি, আপনি সবাই মিলে কিছুটা বাস্তবে বিশ্লেষিত আর কিছুটা কল্পনায় দেখা। আমি শুধু আঙুল চালিয়েছি গণকযন্ত্রের অক্ষরগুলোর ওপর।

শরৎ— ট্যাঁরা ঢাকির খোঁজে

আশির দশকের ঠিক আগে আগে লেকডটাউন আর পাতিপুকুরের সীমান্ত বরাবর রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের এক আবাসন তৈরি হয়েছিল। জায়গাটা পাতিপুকুরের মধ্যেই, কিন্তু অনেকে ঠিকানা বলার সময় পাতিপুকুরের বদলে অভিজাত লেকটাউনের নাম বলাটাই বেশি পছন্দ করতেন। আবাসনটার শুরুতে নাম ছিল পাতিপুকুর গার্ডহাউস। সেই সময় লেকটাউনে থাকতেন ছোটগল্পকার বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, ছদ্মনামে বনফুল। ১৯৭৯ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি মারা যান তিনি। তাঁর কথা স্মরণ করেই এই আবাসনের ভালো নাম হয় বনফুল আবাসন। তো এই গল্প বনফুলকে নিয়ে নয়, বরং সেই আবাসনের দুর্গাপুজো নিয়ে। সম্ভবত আটাত্তর সালেই আবাসনে লোকজন থাকতে শুরু করে আর প্রথম পুজো ১৯৭৯ তেই। শুরুতে প্যান্ডেল খাটিয়ে পুজো হত, তবে পরে পাকা কাঠামো তৈরি হয়, পেছনে একটা ঘর সমেত। সেই দুর্গাদালানে দুর্গাপুজো ছাড়াও বাকি পুজো-আচ্চা হত। কখনো কখনো নাটক বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও হয়েছে। আশির দশকের শুরু থেকেই এই পুজোর বেশ রমরমা। রমরমা ঠিক টাকার অর্থে নয়। মানে আজকাল যেমন আশি ফুট প্রতিমা, অথবা আড়াই কোটি টাকার গয়না পরানো দুর্গা, তেমন নয়। রমরমা ছিল পুজোতে অংশগ্রহণের উৎসাহে। পঞ্চমীর সন্ধেতে ঠাকুর আসত প্রতিবার। ছোটো ম্যাটাডোর ভ্যানে চেপে। গাড়িটা পেছন করে ঠেকিয়ে দেওয়া হত দালানের সঙ্গে। তারপর সে এক চরম উৎকণ্ঠার সময়। ঠাকুর নামানো ছিল এক বিষম কঠিন কাজ। ভাড়া করা কুলি দিয়ে অনেক জায়গায় যেমন ঠাকুর নামানো হয় ব্যাপারটা সেরকম সহজ ছিল না। নাগেরবাজার বা কুমোরটুলি থেকে প্রতিমা গাড়িতে তুলে দিত কুমোরপাড়ার লোকেরাই। কিন্তু তারপর পুরোটাই কিশোর আর যুবকদের দখলে। পাড়ায় আসার পর মায়ের চার ছেলেমেয়ে তো সহজেই ঠাকুর দালানে নেমে আসত। কিন্তু মায়ের ওজন অনেক বেশি। ফলে তাঁকে ঘরে আনতে গিয়ে হাত পা ছড়ত অনেকের। তবে মায়ের আশীর্বাদেই তার থেকে বড়ো বিপদ কখনো ঘটেনি। মা আর তাঁর ছেলেমেয়েরাও যে কখনো কখনো টুকরো আঘাত পেতেন না এমনও নয়। ফলে মায়ের হাতের আঙুল, গণেশের শুঁড়ের ডগা, কার্তিকের গোড়ালি, সরস্বতীর বীণা, লক্ষ্মীপেঁচার নাক ইত্যাদিতে কুমোরের কাছ থেকে চেয়ে আনা পুলটিশ লাগাতে হত অত্যন্ত যত্ন নিয়ে। অনেক সময় দেখতাম নিজের হাতে ব্যান্ডেজ লাগাতে ভুলে গেছে পুজোর কোন উদ্যোক্তা, কিন্তু মা, তার ছেলেমেয়ে আর সঙ্গের পশুপাখিদের সুচিকিৎসায় কোনো খামতি ছিল না। এমনকী অসুরও যথেষ্ট আদর পেত। মুন্ডুকাটা মোষের ভেতর থেকে অসুর যেখানে বাইরে আসার চেষ্টা করত, সেখানটা ভেঙে গেলে খুব সহজে আলতা দিয়ে ব্যাপারটা সামলে দেওয়া যেত।

পঞ্চমীর রাতে সব কিছু সামলে বাড়ি ফেরা। তারপর ষষ্ঠীতে

ঘুম ভাঙত ঢাকের বোলে। আমাদের ঢাকি সেদিন সকালেই চলে আসত খুব ভোরবেলা। ঢাকি রতন। রোগা, লম্বা আর একটা চোখ বেশ অনেকটা ট্যাঁরা। সঙ্গে কাঁসি হাতে তার ছোট্ট ছেলে মদন। সেই সময় আমাদেরই বয়সের। ঢাক বাজানো ছাড়াও তাদের দিয়ে আরও বেশ কিছু পরিশ্রমের কাজ করিয়ে নেওয়া হত। কাদা ঘেঁটে তুলতে হলেও রতন কিংবা মদন, কোনো একটা জায়গা থেকে ফলের বাসন মেজে আনতে হলেও সেই তারাই। অন্য লোকজন যে কাজ করত না তেমন নয়। কিন্তু চোখের সামনে রতন বা মদনকে দেখলেই প্রত্যেকের চিরন্তন মানবিক (নাকি অমানবিক) প্রতিক্রিয়া জেগে উঠত। রতন আমাদের থেকে অনেক বড়ো। আমরা বলতাম রতনকাকু। তো কাকু অভিজ্ঞতার কারণে অনেক বেশি চালাক। তাই বিড়িতে দু-একটা টান দিতে দিতে মাঝে মাঝেই হাওয়া হয়ে যেতেন তিনি। কিন্তু ছোট্ট ছেলে মদন পুজোর আনন্দে মশগুল। গ্রামের থেকে এই কদিন শহরে আসার আনন্দে বোকা মদন সারাদিন একটানা কাজ করে যেত। সঙ্গে 'তাই নানা তাই নানা' শব্দে সারা সন্ধে জুড়ে কাঁসি বাজানো তো আছেই, রাতে মণ্ডপেই শুতে হত তাকে। আমাদের দু-একবার রাত জাগার অভিজ্ঞতায় তাকে যে পরিমাণ মশার কামড় খেয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে দেখেছি তাতে এদেশের খেটে খাওয়া মানুষের সহ্যশক্তির একটা নমুনা পাওয়া যায়।

তখন তো পুজো মহালয়ার আগের দিন থেকে ত্রয়োদশী পর্যন্ত হত না। অর্থাৎ আজকের মতো চোদ্দ দিনের নয়, মাত্র চার-পাঁচ দিনের উৎসব। মাঝে দু-একবার অষ্টমী-নবমী একই দিনে হয়ে গিয়ে আরো একটা দিন কম। ফলে আসার একটু পরেই যেন শেষ হয়ে যেত পুজো। আর দশমীর ভাসানের পরের দিন একাদশীর সকালে ফাঁকা মণ্ডপ দেখে মনটা কেমন হু-হু করে উঠত। তার সঙ্গে মনে পড়ে যেত সামনে এগিয়ে আসা পরীক্ষার কথা, যে কিনা এই কয়েকটা দিন মায়ের আঁচলের আড়ালে নিশ্চিন্তে লুকিয়ে থাকত। একাদশীর দিন ঢাকি বিদায় করা হত। সাড়ে চারশো টাকা নাকি পাঁচশো এই নিয়ে পুজোর বরিষ্ঠ কর্মকর্তাদের সঙ্গে রতনকাকুর খুব একচোট দর কষাকষি হয়ে যেত। পাশে ভ্যাবলার মতো দাঁড়িয়ে থাকত মদন। তারপর বাড়ি বাড়ি গিয়ে বকশিস নেওয়ার পালা। বনফুল আবাসনে ছিল তেরোটা বাড়ি, প্রত্যেকটাতে আটটা করে দু-কামরার ফ্ল্যাট। সেই বাড়িগুলোর সিঁড়ির তলায় ঢুকে দমাদ্দম ঢাক বাজাত রতন, সঙ্গে মদনের কাঁসি। সেই শব্দের তোড়ে বকশিশ দিতে নেমে আসত সবাই। পাঁচ দশ টাকা, পুরোনো জামা কাপড় ইত্যাদি। সব কিছু ঝোলায় পুরে দুপুর দুপুর ট্রেন ধরতে চলে যেত বাপ-ছেলে।

আশির দশকের পরে তিন-চারটে দশক কেটে গেছে। পুজোর প্যান্ডেলে সবাই ঠাকুর দেখে, দেখে আলোর মালা। কিন্তু এখনও কারা যেন মদনকে খোঁজে। একটু রোগা ঢাকি দেখলেই চালশে চাপানো চোখের ওপর থেকে চশমটা খুলে দুবার ঘষে নেয় কেউ কেউ। তারপর ভিড় ঠেলে কাছে এগিয়ে যায়। মদন মেলে না কিছুতেই। কী করে মিলবে? চালশেয় আটকে থাকা লোকটা মদন ভেবে আসলে খোঁজে রতনকে। কিন্তু মদন তো ট্যাঁরা ছিল না মোটে। তাই দুজনের দেখা হয়, খুব কাছ থেকে। কিন্তু চেনাটাই বাকি থেকে যায়। মদনের ছেলে কলেজে পড়ে, তবে ঢাক ছাড়েনি। তাই বাবার সঙ্গে পুজোর কদিন কলকাতায় কাটিয়ে যায়। সঙ্গে মশা তাড়ানোর ওষুধ থাকে। রতন আর কলকাতায় আসতে পারে না, ঢাকেও বোল ওঠে না আর। চুপ করে বসে দেখে কীভাবে উঠোনের একপাশ থেকে অন্য পাশে টুক করে পালিয়ে চলে যায় পুজোর কটা দিন।

হেমন্তের ডেঙ্গি

পুজোর আগে থেকেই ডেঙ্গির উৎপাত। হেমন্তেও পোস্টম্যানের ঝোলায় ভাইরাস। মশার ওষুধে আজকাল কাজ হয় কম। প্রভাবশালী নেতা নেত্রীরা বলে দিয়েছেন রাজ্যে ডেঙ্গি নেই। আর রাজ্য চালান তাঁরাই। ফলে কোনো ডাক্তার ডেঙ্গি নিয়ে কথা বললে তার জিভ আর প্রেসক্রিপশনে লিখলে বুড়ো আঙুল নিয়ে বিশ্লেষণভিত্তিক কাটাছেঁড়া জরুরি। বেসরকারি হাসপাতালগুলোকে ভয় দেখানো আরো অনেক সহজ। ডেঙ্গি রুগির চামড়া ফুটো করে অণুচক্রিকার চক্করে যত খুশি রক্তচোষা যেতে পারে। আপাত চোখ রাঙানির আড়ালে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা থাকবে। কিন্তু ডেঙ্গি বলা বারণ। চিকিৎসা তো বন্ধ করতে বলছি না। বাড়িতে প্রাণভরে জ্বর কমার ওষুধ আর তরল গেল। হাসপাতাল হলে স্বচ্ছ নল দিয়ে প্যাকেটের নুনজল। শুধু চিনে আওয়াজের শব্দটা উচ্চারণ না করলেই হল। কানাকে কানা, খোঁড়াকে খোঁড়া বলতে নেই সেটা আমরা ছোটোবেলা থেকেই জানি। সেই নিয়মে ডেঙ্গি আক্রান্তদের জ্বর হয়েছে বলা চলবে, কিন্তু ডেঙ্গি জ্বরাক্রান্ত বলা চলবে না। ডেঙ্গি আক্রান্তদের জ্বর হলেই শাস্তি। জ্বর ছাড়া ডেঙ্গি হলে ক্ষতি নেই, কারণ তখন রুগি কিচ্ছুটি না বুঝে চিকিৎসা করাতেই যাবে না। জ্বর-বিনে কে আর পয়সা খরচ করে এনএস এক এর পাশে যোগ চিহ্ন খুঁজতে যায়? তারপর আবার সন্দেহাতীত হতে অ্যান্টিজেন আর অ্যান্টিবডি নিয়ে ধস্তাধস্তি। এর থেকে নিজেই অতীত হয়ে যাওয়া অনেক সহজ। তাই ট্যাঁড়া দিয়ে ডাক্তারির পাঠ্যক্রম থেকে জ্বরের পরিচ্ছেদে ডেঙ্গি বাদ।

কিছু বিদ্বজন আবার ডেঙ্গির সঠিক পরিসংখ্যান চায়। ওরে পাগল, মহাবিশ্বে কত কণা আছে তা কি কখনো গোনা যায়?

গুনতে গেলেই গুণফলে ভুল হবে। যোগ আর গুণ তাই বাদ। শুধু ভাগ আর বিয়োগ চলবে। অর্থাৎ আধাখ্যাঁচরা অঙ্ক শিখে যখন তখন ডেঙ্গি নিয়ে পরিসংখ্যানের কচকচি বন্ধ। সময়ভিত্তিক তথ্য বিশ্লেষণের গবেষণায় নতুন ধারা আসবে। ধরা যাক নভেম্বরের এক তারিখে রাজ্যে এই বছরে ডেঙ্গিতে আক্রান্ত মোট মানুষের সংখ্যা তেইশ হাজার। সেই মাসেরই দশ তারিখে সংখ্যাটা কমে তিনশো তেত্রিশ হয়ে যেতে পারে। কী করে মোট সংখ্যা কমবে? সহজ অঙ্ক। যাদের ডেঙ্গি হয়েছে তাদের সংখ্যা যদি যোগ করা হয়, তা হলে যাদের হয় নি তাদেরটা বিয়োগ করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গে মোট মানুষ ধরুন নয় কোটি। ভাবা যাক তার মধ্যে এক কোটি লোকের ডেঙ্গি হয়েছে, আর বাকি আট কোটি ডেঙ্গি-মুক্ত। তা হলে রাজ্যে মোট ডেঙ্গি আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা এক কোটি বিয়োগ আট কোটি, অর্থাৎ ঋণাত্মক সাত কোটি। পাতি জনগণ ধনাত্মক ঋণাত্মকের জটিল অঙ্ক বোঝে না। ফলে বিয়োগটা একবারে করলে গোলমাল। সে জন্যে সুযোগমতো অল্প অল্প করে বাদ দেওয়া হবে। তাই অনেকটা জমে তেইশ হাজার হয়ে গেলে তারপর সুস্থ মানুষদের নামের তালিকা করে সুবিধামতো কিছুটা বিয়োগ করাটাই সঠিক অঙ্ক। হাসপাতালে রাজ্য সরকারি ডাক্তারেরা মন দিয়ে কাজ করছেন না। শুধু রুগি দেখতেই ব্যস্ত। তাই মাঝে মাঝে যোগফল বেড়ে যাচ্ছে। সেজন্যে প্রতি হাসপাতালে আমরা বিয়োগ করার বিশেষ বিভাগ খুলেছি। বেসরকারিদেরও তাই নির্দেশ দিয়েছি। ওরা জানিয়েছে যে এরপর থেকে ডেঙ্গিতে কেউ বিয়োগ হয়ে গেলে তাকেও তাদের সংস্থা বিয়োগফলেই ধরে নেবে। বেসরকারি হাসপাতালে টাকার অঙ্কটাই শুধু যোগ হবে, আর বাকিটা বিয়োগ।

শুধু আঙ্কিক পরিসংখ্যান দিয়েই কি ডেঙ্গি প্রতিরোধ সম্ভব? এর মধ্যে গভীর জিনতত্ত্ব আছে। চরিত্র বদলাচ্ছে ডেঙ্গি। আশির দশকে মাধ্যমিক দেওয়ার সময় জীবনবিজ্ঞানে পড়েছি ভাইরাস লক্ষ কোটিতে খেলে। আজকের দিনে একসঙ্গে এতজনের চরিত্রহনন অসম্ভব। আর চরিত্র মানে যদি পুরোটাই জিনের কারসাজি হয়, তা হলে জিন বদলালে মূল তত্ত্বটাই ঘেঁটে যাবে। ফলে সে আর ডেঙ্গি থাকবে না, ঘুরে ফিরে সেই অজানা জ্বর। আর অজানাকে জানতে না পারলে রোগ নয়, খুঁজে নেব রুগিকেই। এভাবেই সমাজের শত্রুকে চিনে নিতে হবে। সংবাদমাধ্যমের সামনে রুগি বা তার আত্মীয় স্বজন মুখ খুললেই হালকা হুমকি। বেশি বাড়াবাড়ি করলে ধোঁয়া কামান নিয়ে তার ঘরে ঢুকে গোলাবর্ষণ আর বারান্দায় টবগুলোকে উলটে ফেলে জলসিঞ্চন। এতেও কাজ না হলে ডেঙ্গি মশা খুঁজে এনে মশারিতে ভরে দেব। লোকে জিজ্ঞেস করছে ডেঙ্গি তো বিশ্বজোড়া সমস্যা। সে তো রাজ্য সরকারের অপদার্থতা নয়। তা হলে ডেঙ্গি নিয়ে এত লুকোছাপা কিংবা চাপা হুমকি কেন? আরে লুকোছাপা আছে বলেই তো খবর আছে। ব্লিচিং পাউডার ছড়ালে কি খবর হয়? খবর হয় তার বদলে রাস্তায় তামাদি হয়ে যাওয়া আটার আবির ওড়ালে। বর্ষার পর শরৎ অতিক্রম করে হেমন্তেও যদি বস্তির গলিপথে নৌকা ভাসানো যায়, তবেই তো তৃতীয় বিশ্বের জলছবিটা ঠিকঠাক ফুটে ওঠে। এ দেশের গরিব মানুষতো ভুগবেই। তবে কিউলেক্সের গোদের ওপর ঈডিসের এই অজানা বিষফোড়াটা ভীষণ ত্যাঁদড়। মধ্যবিত্ত, এমনকি বেশ বড়োলোকদেরও শান্তিতে থাকতে দিচ্ছে না। ঠিক এই জায়গাটাতেই পিলে চমকানো চিনে উচ্চারণের রোগটায় বামপন্থী শ্লাঘার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। গরিবের ভালো করতে না পারি, বড়োলোকদের খারাপ করা তো সম্ভব। আর সেই অসহায়তায় ভুগছে সমাজের সব স্তরের মানুষ। তাই ওই অসহায়তাটাই একমাত্র চিকিৎসা। কর্কটক্রান্তির নীচে উষ্ণ আবহাওয়ার কলকাতা যে অনেকটা ওপরে থাকা লন্ডন হতে পারে না, আম বাঙালি এই ব্যাপারটা নিশ্চয় এতদিনে আত্মস্থ করেছেন। আর জনগণ খুব বেশি চেঁচামেচি করলে কিন্তু ইবোলা আর করোনা এই সমস্ত বিষয়ও উঠে আসবে, আফ্রিকা থেকে চিন, সবই তো এই বঙ্গে বর্তমান।

শীতের বাড়বৃদ্ধি

কলকাতা শহরে পৌষ-মাঘের প্রতীক্ষায় আকুল বাঙালি। কর্কটক্রান্তির আশেপাশে গরম ভীষণ বেশি, তুলনায় শীতের প্রকোপ কম। গরমের তীব্রতা এই সব জায়গায় কষ্ট দেয়, আর তাই শীতকালের অপেক্ষায় থাকি আমরা। তবে এবারের ঠান্ডা কিছুটা বেশি। কলকাতায় তো বারো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের আশেপাশে তাপমাত্রা ঘোরাফেরা করেছে বেশ কয়েকদিন। তুলনা করার জন্যে বলতেই হয় যে গরমকালে এসির তাপমাত্রা সবথেকে কম থাকে ষোলোতে। আর ভাবুন এবারের শীতে আশেপাশে মফস্বল শহরে, যেমন কৃষ্ণনগর কিংবা পানাগড়ে হিসেব হচ্ছে সাতের আশেপাশে। দমদমে নয় দশ। তাই বিশ্বজোড়া উষ্ণায়নের প্রেক্ষিতে এ এক অন্যরকম খবর। সকালবেলা অফিস যাওয়ার আগে ঠান্ডা জলে চান করা নিয়ে মজার গল্প ঘুরে বেড়াচ্ছে আমার আপনার হোয়াটসঅ্যাপে। শীতের সংকোচনের ঠেলায় বাঙালি পালোয়ানেরা বিপর্যস্ত। সন্ধেবেলা অফিস থেকে ফিরে গায়ে চাপাতে হচ্ছে অনাবিল আলোয়ান। পৌষ সংক্রান্তির হাওয়া বনহুগলীর মোড় ঘুরে হাড় কাঁপিয়ে ঢুকে পড়ছে চ্যাংড়া গলিতে। বঙ্গের পশ্চিমে যে জাতি শীতের অপেক্ষায় আকুল হয়ে দিন গোনে, তারাই এবার ভাবতে বসেছে সরস্বতী পুজো মিটবে কবে। সেদিন যে সকালবেলায়

অঞ্জলির আগে শুদ্ধ হতে হয়। গাঁদাফুল ভুলে পলাশ ফোটার স্বপ্নে বিভোর বাঙালি তাই শীত তাড়িয়ে বসন্তের অপেক্ষায়। তবে এইটুকু শীত নিয়ে আমাদের হাবভাব অনেক সময়েই আলগা ঢঙ। গায়ে এক আধটা গরম জামা, পায়ে মোজা, আর মাথায় বাঁদরের টুপি পরলেই এই শীতকে পাঁচগোল দেওয়া যেত। কিন্তু আড়বুঝো বাঙালি গায়ে চাপাবে হালকা টি-শার্ট, বড়োজোর হাতঢাকা সোয়েটার। তারপর শীতের সকালে কাঁপতে কাঁপতে পাড়ার মোড়ের চায়ের দোকানে ধোঁয়াওঠা ভাঁড়ে চুমুক দিয়ে কুমেরু আস্বাদন। সময় থেমে থাকে না, তাই আলগা রোদ্দুরে গায়ের চাদর সামলাতে সামলাতেই সওদাগরি অফিসের ডাক এসে যায়।

ঠান্ডার কথা আলোচনা করতে গেলে সাইবেরিয়ার এক গ্রামের কথা বলতেই হবে। দূরান্তের পথ পেরিয়ে আমাদের দেশের খবরেও জায়গা করে নিয়েছে সে। নাম তার ওয়মায়াকন। এবার নাকি সেখানে তাপমাত্রা নামে ঋণাত্মক বাষট্টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের নীচে। অতঃপর বিশেষভাবে তৈরি থার্মোমিটারও রণে ভঙ্গ দিয়েছে। তলার দিকটা ফেটে গিয়েছে তার। শোনা যায় উনিশশো তেত্রিশ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সেখানে নাকি তাপমাত্রা নেমেছিল ঋণাত্মক সাতষট্টি ডিগ্রির তলায়। এবারেরটা সেই হিসেবে গত একশো বছরে দ্বিতীয় সর্বনিম্ন। বিশ্বজোড়া সবথেকে কম তাপমাত্রা এযাবৎ মাপা হয়েছে কুমেরুতে, সে হল ঋণাত্মক পঁচানব্বই ডিগ্রি। যাই হোক, সেখানে তো সবসময় মানুষ থাকে না। তাই আবার সাইবেরিয়ার সেই গ্রামের কথায় ফিরে আসা যাক, যেখানে পঞ্চাশজন মানুষ সারা বছর বাস করেন। ওয়মায়াকন মানে 'না জমা জল', সম্ভবত কাছাকাছি এক উষ্ণ-প্রস্রবণের নামে। রুশ সুন্দরীর চোখের পাতায় সেখানে জমা বরফের ছবি। ইন্সটাগ্রামের আলোকবিন্দুতে নীল মণির পাশে কটা রং নাকি কালো সে দেখার সুযোগ নেই। লাস্যময়ী যুবতীর কটাক্ষের অনেকটাই রংসাদা ঝুরো বরফের আড়ালে। কোথাও বা ব্যালের বিভঙ্গে বরফঢাকা গাছের পাশে নৃত্যপটীয়সী। ঊরু থেকে পায়ের পাতা অবধি কাপড় নেই। সোয়ান লেকের আদলে দুপায়ের মাঝে সমকোণ। হাড়কাঁপানো শীতের রাতে এ ছবি দেখতে 'রাজা তোর কাপড় কোথায়' বলার থেকেও সাহস লাগে অনেক বেশি। তবুও মনলোভা সব ছবি ঘুরে বেড়াচ্ছে আন্তর্জালে। ছবি যিনি তুলেছেন তিনি দিব্যি দিয়ে বলছেন যে এসব গণকযন্ত্রে গোলমাল করা ফটোশপে বানানো ছবি নয়, একেবারে সত্যিকারের। আমরা মোটেও অবিশ্বাস করছি না সে কথা। বরং এইসব ছবি দেখে আমাদের কাঁপুনি বেড়ে যাচ্ছে কয়েকগুণ। কলকাতায় বসে সাইবেরিয়ার অনুভূতি আর রাত জেগে শহরের রাজপথে চারচক্রযান চেপে কম্বল বিতরণ করে তৃপ্তির ঢেকুর তোলার সুযোগ। ঘরহারা মানুষের ফুটপাথ বদল হয় মাঝরাতে, আমরা লেপচাপা দিয়ে নাকডাকি। ভোর হয় সকালে আটটা বাজার পরে, শোনা যায় না মুঠোফোনে সকাল বাজার শব্দ, মধ্যবিত্তর বাজার বসে তারপর। ধাপার বড়ো ফুলকপিতে সারের গন্ধ, তাই খুঁজে ফিরি যত্নে জন্মানো সত্যি গ্রামের শিশুফুল। ঢেলে সাজানো সবজির সামনে মাসিদের দেখে অবাক হই। 'কিভাবে উঠলে ভোর তিনটেয়? তারপর ক্যানিং লোকাল, নাকি লক্ষীনারায়ণপুর? বনগাঁ নাকি রাণাঘাট?' তবুও থামে না দরাদরি। ট্যাঁকশালের অতিরিক্ত খুচরো ট্যাঁকে গুঁজে বাড়ি ফেরা।

সপ্তাহান্তে চড়ুইভাতি বাদ দিলে তো চলবে না। দিনের দিন হলে বাস কিংবা ম্যাটাডোরে চেপে সকালে একদিকে হইচই, বিকেলে অন্যদিকে ঘরে ফেরা। বুড়ো সাধুর নেশায় অন্য দলের সঙ্গে মারপিট। অসমান পিচে বিরাট, হাওয়া কমা বলে মেসি, কিংবা হারানো পালকের ফুলে সাইনা-সিন্ধু। একদিন ছুটি বাড়িয়ে সপ্তাহান্তে শান্তিনিকেতন। বর্ণপরিচয়ের একতারা বইয়ের পাতা থেকে লাফ দিয়ে একেবারে বাউলের হাতে। ভোরে উঠে ট্রেন ধরতে হবে। সাতচল্লিশের বুড়োর সাত বছরের পুত্রকে টেনে তোলা। শিশুর অসহায় বিরক্তির বেসুরো চিৎকারের মাঝে ওলা-উবেরের সারথির সঙ্গে কথোপকথন। 'বিটিরোড থেকে বাঁদিকে ঘুরে যান, তারপর সামনে পচা পুকুরের পাশ দিয়ে ডানদিকে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এবার আপনাকে দেখতে পাচ্ছি। আর একটু এগিয়ে আসুন। সরু গলিতে ঢুকতে অসুবিধে হচ্ছে? আরে চলে আসুন না দাদা। বালি ফেলার লরি ঢুকে যাচ্ছে অনায়াসে, আর আপনি আসতে পারছেন না? কতদিন ড্রাইভারি করছেন মশায়?' সাতসকালে শিয়ালদা। প্ল্যাটফর্মে বিস্বাদ কফি। এক ঘণ্টা দেরিতে কু ঝিকঝিক। তারপর দুদিন শীতে কুঁকড়ে মফস্বল। বাঁধনহীন পানভোজন। সপ্তাহান্ত অতিক্রম করে ঘরে ফিরে মাঝরাতে বদহজমের বমি। পরের দিন সকালে ছেলেকে ইস্কুলে দিতে যাওয়ার পুলকারে বস্তাবন্দী করে চাপানো গেল না। শীতকালের বিশ্বাসঘাতকতায় দিনভর অন্য অভিভাবকদের ফোন করে জানতে হল প্রাথমিক শিক্ষার একদিন প্রতিদিনের পাঠ্যসূচি। বেলা বাড়তেও শরীর সায় না দেওয়ায় বছর শুরুতেই অফিসে নষ্ট হল একটা আকস্মিক ছুটি। আসলে সবটাই শীতের দোষ। সে জন্যেই তো গায়ে দিতে হল গরম শাল, অনুসিদ্ধান্তে পেট গরম। কালকে অফিস না গেলে বড়ো সাহেবের কোঁতকা। তাই 'হে যুগসন্ধিকালের চেতনা, আজ আমাকে শক্তি দাও। আর দাও শীতের শেষের তুষার গলানো উত্তাপ'।

অন্য কলকাতা কিন্তু রোজ সকালে জাগে। শীত গ্রীষ্মের ধার ধারে না মোটে। থিকথিকে গা ঘেঁষা শহুরে চালাঘর। এক বাথরুমে কুড়ি জন ঢোকার প্রতিযোগিতায় ঘড়ি বা মুঠোফোনের

কান্না ছাড়াই রাত তিনটেয় ঘুম থেকে ওঠা। শীতের একটাই সুবিধে যে জল খরচ হয় কম। চান না করলেই হল। তেষ্টাও কম পায়। বেলগাছিয়া, রাজাবাজার, উল্টোডাঙা, পাইকপাড়ার ঘিঞ্জি শহরে ভোট অনেক বেশি, বেঁচে থাকার লড়াইটাও। কখনো হঠাৎ করে মনে হয় আজকে শীত বোধহয় অনেক কম। কিছু বুঝে ওঠার আগেই লেলিহান শিখা। বস্তিতে উড়ে বেড়ায় ঘনীভূত কার্বন। সামনে মাধ্যমিক। বইগুলো পুড়ে ছাই। জোগাড় হয়েছে হ্যালোজেন, সঙ্গে গাদাগাদা সূচিছিদ্র ক্যামেরার ঝলকানি। চটজলদি ত্রিপল ঢাকা অস্থায়ী রান্নাঘরে বড়ো কড়াইতে একসঙ্গে খিচুড়ি রান্নার সুবাস। আজকে মাথায় ছাদ ছাড়া শোয়া। তবে আবার ছাদ হবে। বেশ তাড়াতাড়ি। এ তো আর শক্তিশালী সিমেন্ট কিংবা পেশিবহুল লোহার স্তম্ভ দিয়ে বানানো বাইশতলা নয়। পুড়তে যেমন সময় লাগে না, গড়তেও তাই। দু-একদিনের মধ্যেই বাড়ি আবার তৈরি। কিছুটা দূর থেকে টেনে আনা ঝুলন্ত তারে গোধূলি তাড়ানো চল্লিশ পাওয়ারের আলো। পড়তে বসতে হবে। পরীক্ষা এসে গেছে। সমাজসেবিকরা উপহার দিয়েছে নতুন বই। আবার ছবি ওঠে চিৎপুরের বস্তিতে। রুশ সুন্দরী নয়, সাদাকালো ছবিতে আশির দশকের কলকাতার কিশোরী। চোখের জলে বরফ নয়, পুরোটাই বাষ্প। শীত চলে গেলে সেটুকুই ভরসা।

ভালো লাগার বসন্ত

বছরে ৩৬৫ টা দিন। লিপ ইয়ার হলে একটা দিন বাড়ে। বারো মাসে তেরো পার্বণের বাঁধন ছাড়িয়ে এখন প্রতিদিন কিছু না কিছু দিবস। সে সংখ্যা ৩৬৫ বা ৩৬৬ পেরিয়ে গেলে তখন একই দিনে অনেকগুলো করে দিবস হয়। এর মধ্যে আবার ইউনেস্কো কিছু কিছু দিন ঠিক করে দেয়। যেমন এমাসেই ১১ তারিখ বিজ্ঞানে মহিলাদের অবদানের দিন, ১৩ তারিখ বিশ্ব রেডিয়ো দিবস আর ২১ তারিখ বিখ্যাত আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস। ভাষা দিবসের যা হোক কিছুটা বাজার আছে, কিন্তু ১১ আর ১৩ ফেব্রুয়ারির কথা জানতে গেলে আমাদের অন্তর্জালে ঢিল ছুঁড়তে হয়। আর এসবের থেকে এখন অনেক বেশি জানা আছে ১৪ ফেব্রুয়ারি, ভালোবাসার দিন। সন্ত ভ্যালেন্টাইনের ইতিহাস জানে না এরকম লোক বাজারে কিছু আছে বটে, তবে তাদের খুঁজে পাওয়া শক্ত। ভালোবাসা আবার কোনো কিছুর সীমানা মানে না। সে মানচিত্রে কোনো কাঁটাতার নেই, পুরোটাই গোলাপের মোমরঙে রাঙানো। বন্দুক মাটিতে শুইয়ে রেখে চকোলেট হাতে সৈন্যবাহিনী। ভালোবাসার আতিশয্যে পৃথিবীর প্রতিটি দেওয়ালে লেখা হয়ে যায় অজানা নাম। মুশকিল হল কোনটা যে মূর্ত আর কোনটা বিমূর্ত সেটাই গুলিয়ে যায়। পানিপথ অথবা কুরুক্ষেত্রের থেকেও বড়ো যুদ্ধ শুরু হয় উদারনীতির ঝান্ডা ওড়ানো আঁতেল আর সনাতন ভারতের ডান্ডা ঘোরানো স্বয়ংসেবকদের মধ্যে। রাজ্য রাজনীতির দেশপ্রেমিক প্রশ্ন তোলেন বিশ্বপ্রেমিক সমাজতাত্ত্বিকের অবদান নিয়ে।

বিশ্বজুড়ে যতই বিশ্বায়নের অগ্রগতি হোক না কেন, মাঝে মাঝে তো বাঙালি হিসেবে পিছিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। আর তখন ১৪ ফেব্রুয়ারি ফাল্গুনের এক বা দুই— বসন্তের শুরু। এই সময় গ্রাম বাংলার প্রকৃতির কথা আলোচনা করতে গেলে অনেক সুইজারল্যান্ড মুখ লুকোবে। তবে এ বাংলা বিশ্ববাজারে সৌন্দর্য বেচে খেতে ততটা উৎসাহী নয়। আর তাই আজও ফাল্গুনের শুরুতে কখনো কখনো কলকাতার পিচ ঢালা রাস্তার কর্কশ গালে আঙুল বুলিয়ে চলে যায় আদুরে ঠান্ডা হাওয়া। দানবের মতো লরি আর বেয়াদব বাসের মাঝখান দিয়ে পিছলে যাওয়া সাইকেলের মতো পথ খুঁজে নেয় তাজা বাতাস। দমদম স্টেশনের পাশে বেলা গড়িয়ে গেলেও কমদামি সবজিগুলো একেবারে শুকিয়ে যায় না। আশির দশকের কিশোর ব্যাপক বিবর্তনে আজকের প্রৌঢ় বাঙালি বাবা হয়ে কমদামে সে সবুজ কুড়িয়ে নেয়। সামনে ওয়ার্ডের (শব্দ নয়, এ ইংরিজির মানে বাচ্চা) বার্ষিক পরীক্ষার ভ্রূকুটি। তার প্রবেশপত্র জোগাড় করতে এখনও দুটো মাসের মাইনে জমা দিতে হবে, নাহলে মহার্ঘ নম্বর থেকে শুরুতেই পাঁচ বাদ। বসন্ত ফেঁসে গেছে। রাস্তার ধারে ফোটানো চায়ে প্রজাপতি বিস্কুট চুবিয়ে খেতে গিয়ে পাকা গোঁফে ঝুলে থাকে হলুদ ক্যাতর। কাজে যাওয়ার তাড়া নেই, কারণ সেভাবে কাজ নেই কোনো। তাই জীবনযন্ত্রণার সময়ঘড়ি পালটে দিয়ে এক লাফে তিরিশ বছর আগে।

তখন ঘুম থেকে উঠে নিমডালের দাঁতন ছিল। আর আশির দশকের শুরুতে বাজারে নিমপাতা খুব একটা বিক্রি হত না। বসন্তের আলাপে হালকা লালচে রংধরা নিমপাতা তখন দাঁতনের সঙ্গে বিনিপয়সাতেই গাছ থেকে পাড়া যেত। দাঁত মাজা শেষ করেই বোতল হাতে ছুটতে হত হরিণঘাটার টিনঢাকা গুমটিতে। শীতটা সকালের দিকে জানান দিত বলে দু একজনের গায়ে খসটা চাদর থাকত। পুরনো ফাঁকা বোতল ফেরত হত, আর তার বদলে হাতে আসত সোনা বা রুপোর রাংতায় মুখবন্ধ তরল পুষ্টি। তাতে মাঝে মাঝে দু একটা আরশোলা যে মিলত না এমন নয় তবে সঙ্গে বোধহয় দুধের গন্ধটা অন্তত পাওয়া যেত। বসন্তের ভয়ে ইস্কুলে যাওয়ার সময় ভাতের পাতে ডাঁটা-নিমপাতার ঝোল কিংবা নিম-বেগুন ভাজা। সেই সময়ের আর্ধেক ডিমের ডালনা সহস্রাব্দ পালটানোর পর থেকেই গোটা হয়ে গেছে। শীত পেরিয়ে বসন্ত আসত, আর ক্রিকেট পেরিয়ে ফুটবল। পরীক্ষা শেষে শীতের ছুটির এপাড়া বেপাড়ার দুপুরের ক্রিকেট জানুয়ারিতে ইসকুল চালু হতেই দুয়োরানি। বসন্তের শুরুতে তাই বিকেলের ফুটবলই কিশোরদের ভ্যালেন্টাইন।

দক্ষিণ গোলার্ধ থেকে সূর্য পৌঁছে গেছে নিরক্ষ রেখার কাছাকাছি। গরম কম, কিন্তু বিকেলটা লম্বা হতে শুরু করেছে। খেলার পর ঘাম হত, তবে সেটা ভালো লাগা বসন্তের। আর তাই সন্ধের দিকে বাড়ি ফেরার সময় শীত শীত করত। লোডশেডিং-এ মোমবাতি জ্বেলে ঝিমোনোর সেই রাতগুলোকে জাবর কাটতে কী ভালোই না লাগে!

শীতের শেষ আর বসন্তের শুরু মানে স্বার্থপর দৈত্যের মানে ভালো লাগার শিরশিরিনি। পাঁচিলের নীচের ছোট্ট গর্ত দিয়ে গাদা গাদা বাচ্চা শীতঢাকা বাগানে ঢুকে পড়ে এই সময়। প্রত্যেকটা গাছের ডালে একটা করে পুঁচকে ছেলে মেয়ে। সব থেকে ছোটোটাও চেষ্টা করে গাছের ওপর উঠতে। কিছুতেই পারে না। গাছ তার মাথা নুইয়ে ঘাসের কাছে পৌঁছে যায়। ইউনিফর্ম পরা ছোট্ট বাচ্চাটা আবার চেষ্টা করে, কিন্তু হাত বাড়িয়ে কিছুতেই ধরতে পারে না সেই ডাল। মাইনের লাইনটা এগোচ্ছে না কিছুতেই। একবার করে পারছে না আর পাঁচ, দশ, পনেরো, কুড়ি এইভাবে কাটা যাচ্ছে পরীক্ষার নম্বর। আর ঠিক তখনই স্বার্থপর দৈত্য হঠাৎ করে বদলে যায়। তারপর প্রতিদিন সেই ভালো হয়ে যাওয়া দৈত্যের বাগানে বাচ্চাদের কলকাকলি। প্রচুর নম্বর পাচ্ছে সবাই। সব কিছুতে একশোয় একশো। কিন্তু ভালো লাগার শিরশিরিনিটা আস্তে আস্তে বদলাচ্ছে। বুকের কাছে কেমন একটা চাপ ধরে যাচ্ছে। আশির দশকের কৈশোর থেকে থেকে বর্তমানের প্রৌঢ়ত্বে ফেরার তীব্র প্রচেষ্টা। চারদিকে অনেকগুলো লোক, কিন্তু কেমন যেন ঝাপসা লাগছে সব কিছু। কেউ যেন মুখের ওপর একটু ঠান্ডা জল ছিটিয়ে দিল। চারপাশে চাপা গুঞ্জন। ডাক্তার, পুলিশ এই সমস্ত শব্দগুলো ভেসে আসছে অনেক দূর থেকে। তারপর অন্যের মুঠোফোনে চিরবসন্তের ভালোলাগা ছবি— হোয়াটসঅ্যাপ আর ফেসবুক হয়ে পৌঁছে যাচ্ছে অনেক দূরে। দৈত্যের বাগানে খেলে বেড়ানো শিশু অতীত ভালোবাসা ভুলে প্রৌঢ়ত্ব পেরিয়ে অন্তর্জালে অমরত্বের পথে। হাতে ধরা থাকল ইস্কুলে মাইনে দেওয়ার উত্তরফাল্গুনী বিলবই। ১৪ ফেব্রুয়ারি, ভ্যালেন্টাইনস ডে, আর একটা দুষ্টু মিষ্টি ফাল্গুনের শুরু। বসন্ত এসে গেছে।

ছবি : সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

সমাজ না, নাগরিক সমাজ: গ্রামসি বিতর্ক

সায়ন

'নাগরিক সমাজ' কথাটি নিয়ে লিখতে বসে বুঝতে হবে— নগর আসলে একটা সমাজ, আবার সমাজের সঙ্গে এই বিশেষণটিও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সমস্যাটা ঠিক এই জায়গায়। নির্দিষ্ট একটি শ্রেণি আর নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর মধ্যে একটি রাজনৈতিক পরিসর তৈরি হয়। এই পরিসর তৈরির ক্ষেত্রে অনেকগুলি নতুন নতুন অবস্থা বিশ্বব্যবস্থা ও বিশ্বায়নের মাধ্যমে আমাদের কর্ম ও জীবন পদ্ধতির মধ্যে চলে আসছে। এই বিশ্বায়িত নতুন পদ্ধতির মাধ্যমে দেশ ও বিশ্বরাজনীতি কীভাবে পরিচালিত হয়— তার কয়েকটি প্রশ্ন ও চিন্তাতত্ত্ব নিয়ে একটি তর্কের বয়ান রচনা করা যাক। গ্রামসিকে নজরে রেখে এই দেখার একটা রাজনৈতিক কাঠামো তৈরি করা যাক। কেন এই নজরকে চিহ্নিত করা হল? আস্তে আস্তে তর্কের মাধ্যমে তার নিরসন হোক। একটি ভাবনার কথায় আসি— ১৯১৯ সালে ২৩ অগস্ট 'নিউ অর্ডার' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চির চতুর্থ জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে গ্রামসি লেখেন—

> কমিউনিস্ট সাংস্কৃতিক পর্যালোচনার উচিত প্রত্যেক ব্যক্তির মাঝে জীবনের উচ্চতর ও পরিপূর্ণ সামগ্রিক বিকাশের ধারণাকে উৎসাহিত করা... আমরা কেন পারি না আমাদের সুপ্ত-শক্তির দ্বারা যুবকদের মধ্যে ভবিষ্যৎ শিক্ষা ব্যবস্থার কাজ শুরু করতে? আজ এমন অনেক শ্রমিকই রয়েছেন, যাঁরা শ্রেণী সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে এক নয়া মর্যাদাবোধ ও স্বাধীনতাবোধ অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। শ্রমিকগণ যখন প্রখ্যাত কবি শিল্পীর এবং দার্শনিকের নাম শোনেন তখন তিক্ততার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করতেন, "আমাদের কেন জানানো হয়নি এদের নাম?"
>
> আমাদের ভাণ্ডারে সঞ্চিত সহস্র জ্ঞানের মধ্যে এমন উপাদান রয়েছে যার শাশ্বত মূল্য রয়েছে, এবং তা ধ্বংস হবে না এবং হওয়া উচিত নয়... সমাজ পরিবর্তনের প্রজ্ঞা অর্জনের জন্য প্রলেতারিয়তদের মধ্যে একাজ এখনই শুরু হওয়া উচিত।

আবার অন্যদিকে লেনিন তাঁর 'কী করিত হইবে' গ্রন্থে বলেছেন— "শ্রমিকগণ বুদ্ধিজীবীদের অবশ্যই জিজ্ঞাসা করতে পারে; আমরা যা জানি সে সম্পর্কে কম বলুন, আমরা যা জানি না সে সম্পর্কে আমাদের জানান। আমাদের দিন সেই সমস্ত জ্ঞান যা আমরা আমাদের কারখানার জীবন থেকে কখনো শিখতে পারিনি।"

প্রতিটা দিন এখন আমাদের কাটছে গলায় ফাঁস দেওয়া কাঁটাতার দিয়ে। মুক্তকণ্ঠ থেকে এখন গলগল করে বেরিয়ে আসছে রক্ত। তবুও রাজপথ জেগে আছে রাতের পর রাত— আঁধার ঘেরা সকালগুলোতে পুনরাবৃত্ত হচ্ছে নতুন কণ্ঠস্বরের ঢেউ আছড়ে পড়ছে— স্বৈরাচারী রাষ্ট্রব্যবস্থার ক্ষুব্ধ শিয়ালের মতো হিংস্র দাঁত উপড়ে দেওয়ার প্রবল প্রচেষ্টায়। ছাত্র, যুব আর জনগণের হাতে এখন মুক্তির মশালের দাউ দাউ আগুন— শত শত জলকামান দিয়েও তার শিখাকে বুজিয়ে দেওয়া অসম্ভব এটা রাষ্ট্রের কাছে স্পষ্ট।

সংস্কৃতির আজ দুটো স্পষ্ট যুযুধান পক্ষ— সমগ্র জনগণের মুক্তি ও শান্তির জন্য সংস্কৃতি অপর দিকে সনাতন ধারার মুখোশ বেঁধে ক্ষমতার বহুমাত্রিক সংস্কৃতি। নাগরিক সমাজ এখন বাঁচার জন্য প্রশ্ন করছে, উত্তর চাইছে রাষ্ট্র সংস্কৃতির কাছে। জনগণ কী চাইছে আজ? এই প্রতিবাদ কতজনকে জাগিয়ে রাখছে গোটা রাত? কতজনের কাছেই বা মনে হচ্ছে দেশজুড়ে প্রতিবাদ আসলে একটা অনর্থক সমস্যা? তরুণ প্রজন্মের প্রশ্নের উত্তর দিতে কতজন রাজি আছে? সাধারণ বঞ্চিত জনচেতনায় কি এইটুকু প্রবেশ করেছে— সমস্ত লড়াইটা আজ আমরা দেশবাসী করছি (যে যার মতো করে, তার সামাজিক পরিসরে থেকে) একটা বঞ্চনা, অবমাননাহীন দেশ রচনা করতে, বিশ্বের একটি তীব্র জাতিবিরোধী নীতিকে সংহার করে নবরাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়া করতে? এই বিক্ষুব্ধ প্রশ্নগুলি একটা ঝোড়ো সাইক্লোনের মতো উড়িয়ে দিল কয়েকটা পৃষ্ঠা— আমি হাতে নিয়ে দেখি— 'Antonio Gramsi — Cultural Writings'। আমার উত্তরগুলো সব স্পষ্ট করেই লেখা আছে— বরং বলা ভালো তার স্পষ্ট কতগুলি সংকেত দেওয়া আছে। গ্রামসি বলছেন—

'সর্বহারার বিপ্লব একমাত্র সামগ্রিক বিপ্লব নয়।'

তা হলে সর্বাত্মক বিপ্লব আজকের পৃথিবীতে, আজকের আর্থ-সামাজিক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সর্বহারার একার লড়াই নয়। চিন্তাশীল ধারণাযুক্ত নাগরিক সমাজ কেন্দ্রীয় বলয়চক্রের মধ্যে যুক্ত থেকেও এর কার্য ও কাঠামোর উপর কীভাবে প্রভাব বিস্তার করা যায়— জেল নোটবুকের পাতাগুলো তারই সংকেত দেয়।

এই নোটবুকের পাতাগুলো আজকের বিশ্বের নয়া-উদারনীতিবাদী যে ভুয়ো সাংস্কৃতিক অর্থনির্মাণকারী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটা তীব্র ম্যানিফেস্টো রূপ কাজ করে।

মজার বিষয়টা হল, আন্তনিও গ্রামসির চিন্তা ও তত্ত্ব— কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ধারণাস্বরূপ আছে সিলেবাসে। কিন্তু কী সুন্দরভাবে সচেতন প্রক্রিয়ায় গ্রামসিকে সরিয়ে রেখে আমাদের ধারণার জায়গাগুলো হত্যা করার কাজ চলছে। আসলে গ্রামসির নোটবুকের এক একটি চিন্তা ও আখ্যান— মানুষের কথা ভাবায়, মানুষের জন্য জাগায়, মানুষের জন্য কাজ করায়। এই ধরনের গোঁড়ামির বিরুদ্ধেই কাজ করে যেতে হয়েছিল গ্রামসিকে। প্রধান সারির নেতারা সমাজের কাঠামোগত সমস্যাগুলিকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে— এতে উপরিকাঠামোর সমস্যাগুলো লঘু হয়ে যায়। গ্রামসির দ্বন্দ্বতত্ত্বে উঠে আসে কাঠামো আর উপরিকাঠামোর মধ্যে দ্বান্দ্বিক সমস্যার কথা। অর্থাৎ মার্কস যে অর্থনীতিকে ভিত্তি করেছিলেন, গ্রামসির কাছে সেই একরৈখিক চিন্তার জায়গায় প্রবেশ করছে মানবগণ ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রগুলি নিয়ে গঠিত গোটা সমাজ। নাগরিক বা জনগণ যেখানে একটি প্রধান অঙ্গ উপরিকাঠামোর। সামাজিক কাঠামো ও উপরিকাঠামো সর্বদাই একে অপরকে প্রভাবিত করে। আর এই দুইয়ে মিলে গঠিত হয় একটি 'ঐতিহাসিক ব্লক' (historical block)।

বর্তমানে নব্য উদারনীতিবাদ পুঁজিবাদী বিকাশেরই উন্নততর এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। নব্য উদারনীতিবাদের মূল কথা হল অসম ক্ষেত্রে অবাধ প্রতিযোগিতার আয়োজন। পুঁজিবাদের বিকাশের উন্নততর স্তরে যখন নব্য উদারনীতিবাদের আবির্ভাব তখন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে তার উপযোগী করে নব্য উদার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করতে হয়। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে দেশে দেশে এখন যে গণতন্ত্র রপ্তানি হচ্ছে সেটা আসলে এই নব্য উদার গণতন্ত্র। এই গণতন্ত্রকেই আধুনিক পুঁজিবাদীরা এবং সাম্রাজ্যবাদীরা আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। সমাজতাত্ত্বিক মাসুন বলেছেন, মার্কসীয় ভাবনা অনুসারে "নাগরিক সমাজ এবং এর সৃষ্টি রাজনৈতিক সমাজ দুটিকেই অবলুপ্ত করতে হবে, যার জন্য প্রয়োজন সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিপ্লব।" গ্রামসির কাছে নাগরিক সমাজ এবং রাষ্ট্রের ও রাজনৈতিক সমাজের বৈপরীত্য হল দুটি বিপরীত নীতির— আধিপত্য ও প্রভুত্ব সংঘাত। নাগরিক সমাজের কোনো বিশেষ রূপ এবং বিষয়বস্তুর কারণ হল শ্রেণিসংগ্রাম এবং শ্রেণিসংগ্রামের ফলাফলই ঠিক করে দেয় কোন সামাজিক গোষ্ঠী আধিপত্যকারী হবে। রাষ্ট্রকে কেউ নাগরিক সমাজ ও রাজনৈতিক সমাজের যোগফল হিসেবে দেখতে পারে। অন্যভাবে বললে, রাষ্ট্র হল বলপ্রয়োগের বর্মাবৃত আধিপত্য।

সুনীল খিলনানি বলেছেন, ভারতের ক্ষেত্রে নাগরিক সমাজের আলোচনা একই স্তরে ঘোরাফেরা করে না এবং একটি 'সাধারণ ধারণাগত মানচিত্র অনুপস্থিত'। ভারতবর্ষের মতো দেশে নাগরিক সমাজের ধারণা গড়ে তোলার সঙ্গে যে সমস্যাগুলি জড়িত তার অনুধাবন করতে হবে। এই ব্যক্তি পরিবর্তনশীল, স্বার্থকে ক্ষণস্থায়ীরূপে ভাবা এবং রাজনৈতিক আনুগত্য ও সামাজিক সম্বন্ধগুলি আলোচনা ও ধারণা থাকা প্রয়োজন। উদারনৈতিক ও নব্য-উদারনৈতিক ঘরানায় যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে তার উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ নাগরিক সমাজের কাজগুলির পক্ষে অনুকূল নাও হতে পারে। এর ফলে সম্পর্কগুলি হয়ে পড়বে দুর্বল ও অস্থায়ী এবং নাগরিক সমাজ ভিতর থেকেই দুর্বল হয়ে যাবে।

শতবর্ষে খালেদ চৌধুরী

প্রদীপ্ত দত্ত

সালটা ১৯৫৪, মাসটা মে আর তারিখটা ১০.... বাংলা থিয়েটারের এক যুগান্তকারী ঘটনা ঘটল কলকাতার বুকে, ঘটাল বহুরূপী নাট্য সংস্থা, মঞ্চস্থ হল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রক্তকরবী'।

এর বহু বছর পরে শম্ভু মিত্র 'রক্তকরবী' প্রসঙ্গে লিখছেন—

> আমাদের রক্তকরবী ভাল লাগে। যেমন অনেকেরই লাগে। অনেকবারই আমাদের মনে হয়েছে যে ওটা অভিনয় করি। আবার প্রত্যেকবারই মনে হয়েছে যে আমরা পারব না। আমাদের পক্ষে একাজ অত্যন্ত কঠিন। তারপর একদিন খালেদ চৌধুরী 'বহুরূপী'তে এলেন এবং রয়ে গেলেন। লোকটির অস্বাভাবিক ক্ষমতা। আঁকতে পারেন, যে কোনও বাজনা বাজাতে পারেন, গান শেখাতে পারেন, আর যত নতুন নতুন জিনিস উদ্ভাবন করতে পারেন। তাঁকে পেয়ে আবার আমাদের মাথায় রক্তকরবীর চিন্তা পেয়ে বসল।

যাঁর সম্বন্ধে শম্ভু মিত্র এমন কথা বলেছেন তিনি বহুমুখী প্রতিভাধর শিল্পী খালেদ চৌধুরী। যিনি জীবৎকালেই ছিলেন কিংবদন্তি। শিল্পের নানা আঙিনায় ছিল তাঁর অবাধ বিচরণ।

আজ থেকে একশো বছর আগে ১৯১৯ সালের ২০ ডিসেম্বর (৪ঠা পৌষ, ১৩২৬) অসমের করিমগঞ্জ সাব-ডিভিশনের দাসগ্রামে মামার বাড়িতে তাঁর জন্ম হয়। বাবা চন্দ্রনাথ দত্তচৌধুরী ছিলেন জমিদারের নায়েব। দাসগ্রাম থেকে ক্রোশ দেড়েক দূরে চোপড়া গ্রামে তাঁর বাড়ি। মা হেমনলিনী চন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। তাঁরই প্রথম সন্তান খালেদ চৌধুরী। পাঠক, একটু ধন্দে পড়লেন, না? চন্দ্রনাথ-হেমনলিনীর ছেলে 'খালেদ' হয় কী করে? বলছি, একটু ধৈর্য ধরুন। হেমনলিনীর ছোটোমামা গুরুসদয় দত্ত। ব্রতচারী স্রষ্টা গুরুসদয় দত্ত। তিনিই আদর করে নাতির নাম রাখেন 'চিরকুমার'। চন্দ্রনাথ ছেলেকে স্কুলে ভর্তির সময় তাঁর আগের পক্ষের দুই ছেলে চিত্তরঞ্জন ও মনোরঞ্জনের সঙ্গে মিলিয়ে নাম লেখালেন চিররঞ্জন দত্তচৌধুরী।

ছেলেবেলা থেকেই সে স্কুলে আঁকায় দশে দশ পেত। মাটি দিয়ে পুতুল গড়ত। নদীর পাড় ধরে হাঁটতে হাঁটতে মাঝিদের গানের সুর তুলে নিত কানে। তারপর বাঁশের বাঁশিতে গানের সুর তুলত।

১৯২৮ সালে চিররঞ্জন যখন ন'বছরের বালক তখন হেমনলিনীর মৃত্যু হয়। মায়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতি বাবার নির্মম আচরণ বালক চিররঞ্জনকে জেদি এবং বিদ্রোহী করে তোলে।

গ্রামীণ পরিবেশে বড়ো হওয়া বালক চিররঞ্জনের মধ্যে লোকসংস্কৃতির প্রভাব পড়েছিল স্বাভাবিকভাবেই। দিদিমা কাত্যায়নী দেবী ছিলেন 'ধামাইল' নাচের একজন প্রবক্তা, সুতরাং রক্তে তো সে বীজ ছিলই। গ্রাম্য যাত্রাপালাও বালক চিররঞ্জনকে আকর্ষণ করত প্রচণ্ডভাবে। রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে লুকিয়ে লুকিয়ে সে চলে যেত 'পদ্মাপুরাণ' শুনতে। স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে খালেদ বলছেন,

> ওই ব্যাপারটার মধ্যে একটা পিক্টোরিয়াল দিক ছিল। পোষাক পরে দুই হাতে দুই চামর নিয়ে নেচে নেচে গাওয়া হতো এই গান। দীর্ঘ গাথার মতো পদ্মাপুরাণের কাহিনি।......দোহাররা থাকত মূল গায়কের পাশে।.....সেই যে মূল গায়ক ছিল তার নাম ছিল সুরীন্দ্র, তার গান শুনলে আমি আর দাঁড়াতে পারতাম না, দৌড়তাম তাঁর পিছনে।

বাবার অমানবিক নির্যাতনে মা-মরা ছেলেটা আস্তে আস্তে হারিয়ে ফেলে ঘরের প্রতি আকর্ষণ। সেই থেকে শুরু হয় ঘর থেকে পালানোর পালা। বারে বারে ঘর ছেড়ে পালায় সে। কিন্তু ওইটুকু ছেলের আর কতদূর যাওয়ার ক্ষমতা! বাবা ধরে এনে খুব পেটায়। সে মার অকল্পনীয়। এক একবার পেটানি খেয়ে পাঁচ-সাত দিন বিছানা থেকে উঠতে পারে না আর। নয় থেকে সতেরো, একই ঘটনা ঘটে বারবার। ১৯৩৭। ১৮ বছরে পা দিয়েই চিররঞ্জনের চিরদিনের মতো ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়া। কিছুতেই সে আর আসবে না বাবার সামনে। তাই এবার বেশ আটঘাট বেঁধেছে ছেলে। পাশের কায়স্থ গ্রামে স্কুলের এক

মুসলমান বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে খেয়ে ফেলল গরুর মাংস, বাস....

ধর্মান্তরিত না হয়েও তৎকালীন সমাজে জাত খোয়াল ছেলে। তারপর এক জায়গা থেকে আর এক জায়গা। কখনো ইউসুফ, কখনো বা আব্বাস, আবার কখনো বা রহমান। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৩ সাতটা বছর এক ভবঘুরে জীবনযাপন। কখনো লোকের বাড়ি থাকা খাওয়ার পরিবর্তে ছেলে পড়ানোর কাজ, কখনো আবার মোটর গ্যারাজে মোটর মেকানিকের সহকারী হিসেবে গাড়ির তলায় ঢুকে তেল-কালি মাখা। আবার কখনো ইলেকট্রিক মিস্ত্রির সঙ্গে ওয়ারিং-এর কাজে দেওয়ালে ছেনি হাতুড়ি ঠুকে ফুটো করা থেকে কতরকমের কাজ যে করতে হয়েছে, তার কোনো ইয়ত্তা নেই। কখনো আবার গান গেয়ে দুটো পয়সা রোজগার করছেন। সময়টা ১৯৩৯-৪০

> ...যে বাড়িতে আমার থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা হল, সে বাড়ির ভদ্রলোক গান শুনলে ভীষণ রেগে যেত। এককালে সে গুণ্ডা ছিল। দাড়ি রেখে সে মুসল্লি হয়ে গেছে। অর্থাৎ খুব রিলিজিয়াস হয়েছে। তখন তো সায়গল, পঙ্কজ মল্লিক, শচিনদেব বর্মণ— এঁদের গান খুব গাইতাম। সে বলত, এ কী সমস্ত গান! গহের ইসলামি কাজ সব...

বাস আবার ওখান থেকে আর এক জায়গায়। গঞ্জ মতো একটা জায়গা, সেখানকার নাম আম্বরখানা। মাঘ মাসের ঠান্ডায় সেখানে সাত-আট দিন না খেয়ে একটা মসজিদের খোলা বারান্দায় একটা জামা আর পায়জামা পরে পুকুরের জল খেয়ে কাটিয়ে দিল রহমান। হ্যাঁ, তখন ওই নামটাই ছিল।

> ...কারোর কাছে তো কিছু চাইতে পারছি না। প্রচণ্ড খিদে লাগছে, আমি জল খাচ্ছি... বমি বমি পাচ্ছে, কিন্তু বমি হচ্ছে না।

একবগ্গা ছেলেটার আত্মসম্মান বোধ যে শেষ দিন পর্যন্ত ছিল প্রবল। সাতদিন পর একদিন এক সকালে নমাজ পড়তে আসা এক গরিব ধর্মপ্রাণ মানুষ বাড়ি নিয়ে গিয়ে চা-নেড়ে বিস্কুট দিয়ে তার প্রাণটুকু বাঁচিয়েছিল। সেই মানুষটার কথা শেষ দিন পর্যন্ত ভোলেননি খালেদ।

> সেই লোকটা কিন্তু নমাজ পড়ল না। ইসলামের নিয়ম অনুযায়ী নমাজ পড়া মানে তো আল্লাকে স্মরণ করা, তা একটা সৎ কাজের মধ্য দিয়ে সে আল্লাকে স্মরণ করল। মসজিদে গিয়ে রুটিনমাফিক ওঠ-বস করার চেয়ে একটা অভুক্ত মানুষকে খেতে দেওয়া, তার মুখে হাসি ফোটানোটা যে অনেক বড়ো কাজ, সেটা ও করে দেখিয়েছে। ইসলামি যে ভ্যালুজ, তার মধ্যে পড়ে এইগুলো। আমি দেখলাম যে আমার প্রাইডকে ইনজিওর্ড না করে অবলীলায় সে ওই কাজগুলো করে গেল।

ওই মানুষটার মূল্যবোধ তাঁকে এতখানি ছুঁয়ে গেছে যে সেই মানুষটার নাম যে গফুর আর তার জীবিকা মোড়া তৈরি করে বিক্রি করা সেটা মৃত্যুর আগে পর্যন্ত ভুলতে পারেননি। ওই গফুরের বাড়িতে দিন দুই থাকা খাওয়া খানিকটা সুস্থ হয়ে ওঠা। তারপর আবার চলা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সিলেটে। সাইনবোর্ড-হোর্ডিং, মিলিটারির গাড়ি রং করা কোনো কিছুতেই পিছপা নয় ছেলেটা। সেটা ১৯৪২-৪৩ কম্যুনিস্ট পার্টির একটা সম্মেলন হবে সিলেটে। কলকাতা থেকে তাবড় তাবড় নেতা গেছেন। ধাঙড় ইউনিয়নের নেতা, বিনোদবন্ধু দাস, একটা ছোট্ট ছবি দিয়ে সেটা বড়ো করে এঁকে দিতে বললেন। একটা ফুল শিট পেপারে ক্রেয়নে আঁকলেন আর নীচে সই করলেন খালেদ চৌধুরী। ছবিটা ছিল স্ট্যালিনের।

চিরকুমার থেকে এই ভাবে ধাপে ধাপে খালেদ চৌধুরী হয়ে ওঠা। 'খালেদ'-এর অর্থ 'চিরকালীন' বা 'চিরস্থায়ী' এক মৌলবির থেকে সেটা জেনে নিয়েছিলেন। সুতরাং চিররঞ্জনের 'চির'টা রয়ে গেল। আর দত্তচৌধুরীর 'দত্ত'-কে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে শুধু 'চৌধুরী'। হিন্দু মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের মধ্যেই 'চৌধুরী' পদবিটা চলে কিনা। পরবর্তীকালে ছেচল্লিশের দাঙ্গার সময় দেখতে পাই পার্ক সার্কাস অঞ্চলে ধুতিকে লুঙ্গির মতো করে পরা খালেদ চৌধুরী উত্তর কলকাতার হিন্দু মহল্লায় ধুতিকে কাছা দিয়ে পরে হয়ে যান কালী চৌধুরী।

১৯৪৫ সালে খালেদ চৌধুরী সিলেট থেকে কলকাতা আসেন আর্ট স্কুলে ভর্তি হওয়ার বাসনা সঙ্গে করে। এক বান্ডিল স্কেচ নিয়ে গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের শিক্ষক জয়নুল আবেদিনের পার্কসার্কাসের বাড়িতে হাজির।

'আর্ট স্কুলে ভর্তি হতে চাই।' (তখনও আর্ট কলেজ নাম হয়নি, সেটা হয় খুব সম্ভবত ১৯৫২ সালে) জয়নুল উলটে পালটে বারবার ছবিগুলো দেখলেন, মুখ তুলে বললেন, 'এগুলো তোমার আঁকা?' ২৫ বছরের টান টান ঋজু চেহারার যুবক খালেদ ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। জয়নুল নিদান দিলেন, 'আর্ট স্কুলে ভর্তি হওয়ার দরকার নেই।' অথচ জয়নুল কিন্তু খালেদকে জুড়ে নিলেন নিজের সঙ্গে। কামরুল হাসান আর খালেদ জয়নুলের অনেক কাজের শাগরেদ।

স্ট্যালিনের ছবি আঁকার পর সেই ১৯৪৩ সাল থেকেই আইপিটিএ-এর হয়ে পোস্টার আঁকে খালেদ। চিত্তপ্রসাদ, জয়নুলের মন্বন্তরের ওপর আঁকা ছবি তার ওপর প্রভাব ফেলেছিল সেই সিলেটে থাকতেই। পোস্টার আঁকতে আঁকতে গুনগুন করে গানও গায়। পাশের ঘরে থাকতেন পার্টির হোলটাইমার হেমাঙ্গ বিশ্বাস। কানে যায় খালেদের গান। টেনে নেন গানের দলে। ১৯৪৫ সালে কলকাতায় এসে আইপিটিএ-

এর কলকাতা শাখার যে-কোনো অনুষ্ঠানে ভীষণ অপরিহার্য হয়ে পড়ল সেই যুবক। পোস্টার আঁকা তো চলছেই, নির্মলেন্দু চৌধুরীর সঙ্গে জুটি বেঁধে গান গায়। আবার শম্ভু ভট্টাচার্যর সঙ্গে নাচের দলেও তাকে দেখা যায়। আইপিটিএ-এর নাটকের শাখা মেদিনীপুরে নাটক করতে চলেছে, নাটক নবান্ন। একজন অভিনেতা পারছে না যেতে। তাতে কী আসে যায়? আছে তো একজন, 'সর্বঘটে কাঁঠালিকলা'।

আমার এই ধৃষ্টতা মাপ করবেন পাঠক। এটা আমার কথা নয়। বিশেষণটা সুচিত্রা মিত্রর মুখ থেকে বেরিয়েছিল।

'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'র একটা অনুষ্ঠান হচ্ছে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট মঞ্চে। সময়টা ১৯৪৬ সালের গোড়ার দিকে। উদ্বোধনী সংগীত গাইল নিপুণা লাহিড়ী ও খালেদ চৌধুরী। গানটা ছিল হেমাঙ্গ বিশ্বাসের লেখা 'বলো সখি বলো, বলো আমারে ও কি ঘরের বার কুলের বার করল নারীরে'...... এরপর মঞ্চে গান গাইতে বসেছেন জর্জদা মানে দেবব্রত বিশ্বাস। তবলচি এসে পৌঁছতে পারেনি। কে বাজাবে? কেন, সেই লম্বা পেটা চেহারার কমরেড। সে তো খাড়াইয়াই আছে, ওই পোলাডাই বাজাইয়া দ্যাবে হ্যানে। এরপর বসলেন সুচিত্রা মিত্র। বাজিয়ে তখনও গরহাজির। অগত্যা তাঁর সঙ্গেও বাজাবার জন্য ছেলেটাই ভরসা। প্রায় সমবয়সি সুঠাম ছেলেটিকে সুচিত্রা দেখেছেন গানের দলে। ছবি আঁকে, সেটাও জানা আছে কিন্তু সে যে বাজাতেও পারে সেটা দেখে সুচিত্রা মিত্র অবাক হয়ে বলে ফেললেন, 'আপনি দেখি সর্বঘটে....'

আইপিটিএ করছেন একটা আদর্শ নিয়ে। কিন্তু আদর্শ দিয়ে তো আর পেট ভরে না তাই পেটের ব্যবস্থা করবেন বলে পেশা হিসাবে বেছে নিলেন প্রচ্ছদশিল্পকে। এতদিন কম্যুনিস্ট পার্টি লাইন অনুসারে বিষয়বস্তুর ভাবনাকে তুলে ধরেছেন পোস্টারে। এবার লেখক তাঁর ভাবনাকে যেভাবে প্রকাশ করেছেন কবিতা-গল্প-উপন্যাসের পাতায় সেটাকে এক পাতায় বোঝাবার কাজ তুলে নিলেন জীবিকার জন্য। খালেদ বলছেন, 'প্রচ্ছদ আমার কাছে মনে হয়েছে পোস্টারের ছোট সংস্করণ'। ১৯৪৬ সালে তাঁর প্রথম প্রচ্ছদ ডাইসন কার্টারের 'সোভিয়েত বিজ্ঞান'। সেই প্রচ্ছদ সম্বন্ধে খালেদ বলছেন,

> ...প্রচ্ছদে ছিল একটা স্টার-প্রবল বেগে রকেটের মত সেটা ওপরে উঠছে। সোভিয়েত দেশটাকে আমি স্টার হিসাবে সিম্বলাইজ করেছিলাম। সোভিয়েত বিজ্ঞানও যেন একইভাবে রাইজ করছে। এঁকে ফেলার পরে পরেই মনে হয়েছিল প্রচ্ছদ আঁকাই বোধ হয় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম। এর বাইরে আর কিছু নয়।

সেই শুরু। ১৯৪৬ থেকে ১৯৯৯ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে চার/পাঁচ হাজার প্রচ্ছদ এঁকেছেন। আর অলংকরণ যে কত হাজার তার কোনো হিসাব এখনও পাইনি।

আদর্শগত কারণেই আবার এক সময় আইপিটিএ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললেন। সেটা ১৯৪৯ সাল। ওই সময় শম্ভু মিত্রও বেরিয়ে এসেছেন আইপিটিএ থেকে। তিনি নাটকের দল গড়লেন কলিম শরাফির মতো কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে। এই একলা ঘরছাড়া চালচুলোহীন খ্যাপা ছেলেটার সঙ্গে বেশ ভাব জমেছে শম্ভু মিত্রের। বললেন, 'নাটক করতে ইচ্ছা করে না?' অকপট স্বীকারোক্তি যুবকের, আমার দ্বারা ওটা হয় না। শম্ভু মিত্রও ছাড়ার পাত্র নন, লেগে থাকলেন। নিউএম্পায়ারে নতুন নাটকের জন্য পোস্টার করিয়ে নিচ্ছেন, নাটক দেখতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। এরপর কখন যেন মিত্র পরিবারের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়লেন। শম্ভু-তৃপ্তির কন্যা শাঁওলিকে সন্তান স্নেহে কাছে টেনে নিলেন। শম্ভু মিত্রর জোরাজুরিতে জড়িয়ে পড়লেন বহুরূপের 'রক্তকরবী'র সঙ্গে। ১০ মে ১৯৫৪, রেলওয়ে ম্যানশন ইনস্টিটিউট-এ 'রক্তকরবী' প্রথম অভিনয়েই এক আলোড়ন ফেলে দিল। বাংলার নাট্যআন্দোলনে নিয়ে এল এক বিপ্লব। মঞ্চ, আবহ ও পোশাক পরিকল্পনা খালেদের মস্তিষ্কপ্রসূত। শম্ভু মিত্র চিনে নিলেন এই বহুমুখী প্রতিভাধর শিল্পী খালেদ চৌধুরীকে। আরেক প্রতিভা আলোকশিল্পী তাপস সেন। শম্ভু-তাপস-খালেদ (ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর) একত্রিত হয়ে বাংলা নাটককে সমৃদ্ধ করে তুললেন। 'রক্তকরবী'র পর 'স্বর্গীয় প্রহসন' 'অংশীদার' 'ডাকঘর' 'পুতুলখেলা'র মতো একটার পর একটা নাটক মঞ্চস্থ করে সাড়া ফেলে দিল বহুরূপী।

এরপর আর তাঁকে থামতে হয়নি কখনো। ১৯৫৪ থেকে ২০০৪— বহুরূপীর 'রক্তকরবী' থেকে রঙ্গকর্মীর 'মন্টো ঔর মন্টো' পর্যন্ত শতাধিক নাটকের মঞ্চভাবনার রূপকার খালেদ চৌধুরী। বেশ কিছু নাটকের আবহ ও পোশাকপরিকল্পনাও তাঁর। রক্তকরবী নাটকে প্রথম আবির্ভাবেই মঞ্চ-আবহ ও পোশাক— এই তিন বিভাগেই খালেদ চৌধুরী দুর্দান্তভাবে সফল।

'রক্তকরবীতে সংগীত প্রয়োগ' প্রবন্ধে শম্ভু মিত্র লিখছেন,

> ...দরকার ছিল এক মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির, এক অনন্য বোধশক্তির, যার মধ্যে সঙ্গীত ও নাট্যাভিনয় গভীরভাবে অনুভূত। সেই অনন্য বোধশক্তির প্রমাণ আছে শ্রী খালেদ চৌধুরীর সুরের সৃষ্টিতে।
>
> নাট্যের শুরু হয় একা নন্দিনীকে দিয়ে। সে মঞ্চের ওপর একটা চবুতরায় বসে ফুলের মালা গাঁথছে। এইখানে এমন একটা কিছুর দরকার হল যাতে নাটকের একটা মানে প্রকাশ পায়। কল্পনা হল এই যক্ষপুরীতে সুরকে খণ্ডিত করে বেসুরের প্রতাপ। খালেদ চৌধুরী টিউনিং ফর্ক নিয়ে বেরোলেন পুরোনো লোহালক্কড়ের দোকানে খোঁজ করতে। জোগাড় করলেন গোটাকতক ভাঙা লোহার পাত। যেগুলো

আলাদা পর্দায় বাজবে। সেই বাজানোর ছন্দে মাঝে মাঝে নাকাড়ার ওপর ঝাঁটা মেরে, কাঠের টুকরোর ওপর মেরে, একসঙ্গে একটা যন্ত্রের আওয়াজ তৈরি হল। তারপর সেই বাজনাটা মেলানো হল বাঁশির সঙ্গে। বাঁশির আওয়াজ ব্যবহৃত জীবনের উৎসারিত সুরের মতো, আর অপর আওয়াজগুলো যেন যান্ত্রিক জীবনের বেসুর। সে কেবলই বাঁশির আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠতে চায়।... রক্তকরবী নাট্যের শুরুটা যাঁর মনে আছে তিনিই জানবেন এটা একটা অদ্ভুত সুরসৃষ্টি। অথচ সেখানে একটা 'বাঁশি' ছাড়া আর কোনো বাদ্যযন্ত্র ছিল না।

এইরকম উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় শ্রী খালেদ চৌধুরী রক্তকরবীর পরতে পরতে দিয়েছেন।

১৯৪৮-৫০, খালেদ থাকতেন বেকবাগান রো-এর বাড়িতে। আরেক অনুজপ্রতিম বন্ধু সলিল চৌধুরীর সঙ্গে পরিকল্পনা করলেন একটা অর্কেস্ট্রা তৈরি করবেন। অজয় সিংহরায়, নীহারবিন্দু সেনের মতো বাজিয়েরা সব জড়ো হলেন। কিন্তু সেই পরিকল্পনা আর বাস্তবায়িত হল না নানা কারণে। খালেদ তখন বাজাতেন সেতার।

সলিল আমাকে বলল, তুমি কেন সেতার বাজাও? ঘরে ঘরে সেতার বাজায়। তুমি ভায়োলিন বাজাও। আবার ভায়োলিন তো আমি ইন্ডিয়ান স্টাইল-এ বাজাতাম। ও বলল ওয়েস্টার্ন সাইল-এ বাজাও। আমাকে জে নস্করের কাছে নিয়ে গেল।...

এই প্রথম গুরু ধরে নাড়া বেঁধে একটা বাজনা শেখা খালেদের। সেতার, এসরাজ, দোতারার মতো তারের বাজনায় সিদ্ধহস্ত যুবক পাশ্চাত্য সংগীতে তালিম নিতে শুরু করল যখন, তখন তাঁর বয়স একত্রিশ। এই প্রতিভাধর শিল্পী সম্বন্ধে আর এক প্রতিভা কী লিখছেন দেখে নি......

শ্রী খালেদ চৌধুরী নামধারী একজন অত্যন্ত বিনয়ী এবং ভদ্র যুবকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘের' সূত্রপাতের সময় এবং কালক্রমে তিনি আমার অত্যন্ত স্নেহভাজন হয়ে ওঠেন। তাঁকে অবশ্য আমি জানতাম চিত্রশিল্পী এবং মঞ্চসজ্জাশিল্পী হিসাবেই। তিনি প্রায়ই আমার খোঁজ-খবর করতেন এবং এখনও করেন। কয়েক বৎসর আগে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তার সময় নানাধরনের ভারতীয় লোকসঙ্গীত, এমনকি বিদেশী সঙ্গীত-রচয়িতাদের সম্বন্ধে তাঁর অসামান্য জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে তাজ্জব বনে গিয়েছিলাম। যদিও খালেদ বয়সে আমার চাইতে বেশ ছোট, তবুও সেদিন থেকে তাঁকে মনে মনে আমার 'ওস্তাদ' বলে মেনে নিয়েছিলাম। তারপর থেকেই অনেক ব্যাপারে আমি খালেদের পরামর্শ চেয়ে থাকি।

ওপরের এই কথাগুলো দেবব্রত বিশ্বাস তাঁর 'অন্তরঙ্গ চীন' গ্রন্থের ভূমিকায় খালেদ সম্পর্কে তাঁর ভাবনা ব্যক্ত করেন।

ছেলেবেলা থেকেই গ্রামীণ সংগীতের মধ্যে বেড়ে ওঠার জন্য তাঁর অস্থি-মজ্জার মধ্যে সেটা ঢুকে গিয়েছিল। অনেক পরে শহরে এসে প্রত্যক্ষ করলেন যে গ্রামজ লোকসংগীত শহুরে ছোঁয়া পেয়ে বিকৃত হয়ে চলেছে। সেটাকে রক্ষা করা যায় কি না এই ভাবনা থেকে ১৯৬৫ সালে শ্রীমতী নীহার বড়ুয়া, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, অমিতা চক্রবর্তী, রণজিৎ সিংহ এবং আরো কয়েকজন সমমনস্ক মানুষকে নিয়ে গড়ে তুললেন Folk Music and Folklore Research Institution। যার মূল উদ্দেশ্য ছিল লোকসংগীত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও লোকসংগীতের বিকৃতি রোধ করা। পশ্চিমবঙ্গ ও প্রতিবেশী রাজ্যের নানা অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে সংগ্রহ করলেন লোকসংগীতের আঞ্চলিক সুর, তার কথা ও ভঙ্গি। তৈরি করলেন লোকসংগীতের স্বরলিপি। এ এক বিশাল গবেষণা। লোকসংগীত ভাবনা নিয়ে নানা সময়ে অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন খালেদ। সেগুলো একত্রিত করে 'লোকসঙ্গীতের প্রাসঙ্গিকতা ও অন্যান্য প্রবন্ধ' নামে একটি মূল্যবান গ্রন্থ রেখে গেছেন তিনি। তাঁর আর একটি মূল্যবান গ্রন্থ হল 'থিয়েটারের শিল্পভাবনা'। নাটকের ছাত্রছাত্রীদের জন্য এটা এক সম্পদ।

নানা মানুষের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করে, দিনের পর দিন তাঁর সঙ্গ পেয়ে যেটা মনে হয়েছে, সেটা হল খালেদ চৌধুরী একজন ভালো শিক্ষক, আদর্শ অভিভাবক, ছোটোদের খুব ভালো বন্ধু, নিরহংকার, নির্লোভ, নির্লিপ্ত একজন মানুষ। এমন এক বহুমুখি প্রতিভার সান্নিধ্য আমায় প্রতিদিন একটু একটু করে সমৃদ্ধ করেছে। শিল্পী খালেদ চৌধুরীকে ছাপিয়ে মানুষ খালেদদা আমার কাছে অনেক অনেক আপন।

কখনো কারুর কাছে তাঁর কোনো প্রত্যাশা ছিল না, নিজের কাছে ছাড়া। নিজেকে শাসন করার জন্য তাঁর এক হাতে ছিল এক অদৃশ্য চাবুক। বাবা ছেলেবেলায় যখন অমানুষিক মারধর করতেন তখন সব সময় বলতেন, 'বংশের কলঙ্ক, রাস্তা ঘাটে লাথি ঠোকর খাবি, অপঘাতে মৃত্যু হবে।' এই তিনটে কথা সব সময় তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াত। তাই নিজের কাছেই নিজে চাইতেন বাবার কথাকে মিথ্যা প্রমাণিত করতে।

প্রচণ্ড রসিক খালেদদা মৃত্যুকে নিয়ে রসিকতা করতেও কম ছিলেন না। একদিন প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল, অক্সিজেন মাস্ক পরানো, দেখলাম কী যেন একটা বলার চেষ্টা করছেন। ইশারায় থামতে বললাম। কিছুক্ষণ পরে যখন কিছুটা সুস্থ বোধ করছেন তখন দুর্বল ক্ষীণ কণ্ঠে মুখে হাসি মাখিয়ে, 'তখন বলছিলাম যে সাইকেলের হাওয়া পড়ে গেলে না হয় সিরিঞ্জ দিয়ে হাওয়া ভরলে আজ, কিন্তু যে-দিন টায়ার পাংচার হয়ে যাবে সেইদিন কী করবে?' ভাবুন পাঠক, সেটা কখন বলার চেষ্টা করছিলেন?

হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে যখন বুকটা হাপরের মতো ওঠা নামা করছে শ্বাস কষ্টে! আর এক দিন, তখন শরীরের অবস্থা খুবই খারাপ। বুঝে গেছেন যে মৃত্যু আর বেশি দূরে নয়। বললেন, 'আমি কিন্তু নরকে যাব, স্বর্গে ভীষণ ভিড়। সবাই পুজো আচ্ছা করে, চোর ডাকাত ও গঙ্গা স্নান করে পুন্যি করে। দেখো না, সব ব্যবসায়ী, নেতা মন্ত্রীরা গাদা গাদা পাপ করে চলে যায় কুম্ভ মেলায় নয়তো গঙ্গাসাগরে। কেউবা আবার হজ করতে। ব্যাস্‌স্‌স্‌ ওদের সব পাপ মকুব। ওরাও সঙ্গে যাবে। অত ভিড় ভাড়াক্কা আমার পোষাবে না। আমি পুজোও করিনি, গঙ্গাস্নান অথবা নমাজও পড়া কোনোটাই করিনি সুতরাং নরকেই...... নরকে কী আর হবে, একটু গরম তেলের কড়াইতে ছানচা দিয়ে ভাজবে নয়তো বরফের স্ল্যাবের ওপর শুইয়ে রাখবে। খানিকক্ষণ জ্বালা করবে তারপর সয়ে যাবে। যমদূতেরাও বিরক্ত হয়ে হাল ছেড়ে দেবে। এখন ওর চেয়ে আর কমটাই বা কী হচ্ছে!'

তার মানে তখনই তিনি পাচ্ছেন সেই যন্ত্রণা। মৃত্যুকে এইভাবে গ্রহণ করতে আমি কখনো কাউকে দেখিনি। ঠিক যেন এক সন্ন্যাসী।

ছবি : সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

পিনাকী মিত্র স্মরণ

সুভাষ ভট্টাচার্য

সে এমনই একজন মানুষ যার পাণ্ডিত্য ও বিজ্ঞতা অতিবিরল, ঈর্ষণীয় ছিল যার নির্ব্যাজ আচরণ। সরলচিত্ততা ছিল এতটাই যে, মুহূর্তে সকলকে বিশ্বাস করে ফেলত সে। আর তার পরিণাম, পদে পদে অস্বস্তি। যার সম্বন্ধে এই অতীতকালের ক্রিয়াপদ ব্যবহার করছি, সে আমার প্রাণপ্রিয় বন্ধু পিনাকী মিত্র, যাকে আমার 'অল্টার ইগো' বললে ভুল হয় না। কথাটা আমার নয়। বলেছিল পিনাকীই কয়েক বছর আগে, কোনো এক প্রসঙ্গে, আমারই সম্পর্কে। পিনাকী নেই আজ। চার মাস আগে সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণে মৃত্যু হয়েছে তার। এই মৃত্যু অনাকাঙ্ক্ষিত, আকস্মিক। সে-মৃত্যুর অভিঘাত কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হচ্ছে না আজও, না তার স্ত্রী-কন্যার পক্ষে, না আমার পক্ষে।

পিনাকী সব অর্থেই এক বিরল গোত্রের মানুষ। আমার আশি-উত্তীর্ণ দীর্ঘ জীবনে পিনাকীর মতো মানুষ আর দেখিনি। এই সহপাঠী বন্ধুর কথা বলতে বা লিখতে গেলে আত্মসংযমন একরকম অসম্ভব হয়ে পড়ে। চোখের জল রোধ করতে পারি না, গলা বুজে আসে।

কলকাতার পাঠভবন স্কুলের গণিত আর রাশিবিজ্ঞানের শিক্ষক ছিল পিনাকী। শুধু এ দিয়ে তাকে বোঝা যাবে না। আমাদের সময়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে গণিত-বিভাগের বিস্ময়-ছাত্র সে। অনার্স ও এম.এ. (পিয়োর ম্যাথ) দুই পরীক্ষাতেই আশ্চর্য রকম বেশি নম্বর পেয়ে ফার্স্ট হয়েছিল। বিভাগীয় অধ্যাপকেরা তার বিস্ময়কর অঙ্কজ্ঞানের জন্যে তাকে রীতিমতো সমাদর করতেন। আমি জানতাম গণিতে তার initiation-এর উদ্‌বোধন বালক বয়সেই হয়েছিল, উদ্‌বোধক ছিলেন মেসোমশাই, পিনাকীর বাবা। হিন্দু স্কুলের অঙ্কের দিকপাল শিক্ষক রাখালচন্দ্র মিত্র।

অল্প কিছুকাল অন্য একটি স্কুলে পড়িয়ে পিনাকী চলে আসে পাঠভবন স্কুলে। লোকমুখে পিনাকীর কথা জেনে উমাদি (উমা সেহানবিশ) তাকে ডেকে নেন পাঠভবনে। এই খবর আমাকে বলবার সময় তার চোখদুটো জ্বলজ্বল করছিল, যেন জীবনের সেরা জিনিসটাই সে পেয়ে গেছে। পাঠভবনে খুশিমনে যোগ দিল পিনাকী, অবসরও ওখান থেকেই।

মাঝের একটা ঘটনার কথা বলতেই হবে। সম্ভবত ১৯৭৩-৭৪ সালের কথা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তরে বিশুদ্ধ গণিত বিভাগে একটি লেকচারার-এর পদ খালি হয়েছে। বিভাগের একজন প্রবীণ অধ্যাপক বঙ্কিমবাবু (সম্ভবত বিভাগীয় প্রধান) পিনাকীর কাছে খবর পাঠালেন, অবিলম্বে আবেদন করতে বলে। পিনাকী তার স্যারকে সবিনয়ে জানাল, সে পাঠভবনে পড়িয়ে বেশ তৃপ্তি পাচ্ছে। তার মনপ্রাণ জুড়ে রয়েছে পাঠভবন, আর পাঠভবনের ছেলেমেয়েদের অঙ্কের ভিত তৈরি করা আর মজবুত করার কাজটা। কী করে সেসব ছেড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবে সে! যে-কোনো মানুষ এমন সুযোগ পেলে হাতে চাঁদ পেয়ে যায়। পিনাকী গ্রাহ্যই করল না। অথচ শিক্ষাগত যোগ্যতায় তার ধারেকাছেও কেউ ছিল না তখন।

পাঠভবনের শিক্ষকতায় খুবই সফল ছিল পিনাকী। কিন্তু কেন যেন আমার ধারণা হয়েছিল তার ক্লাস করে বেশি উপকৃত হত মেধাবী ও আগ্রহী ছাত্রছাত্রীরা। তারা 'পিনাকীদা'-র কাছ থেকে পেয়ে যেত অঙ্কের মজা, অঙ্কের রহস্য উদ্‌ঘাটনের আনন্দ। প্রায় প্রত্যেক ক্লাসে গোড়ার দিকে গিয়ে বলত, ছেলেমেয়েদের নম্বর পাইয়ে দেবার জন্যে পড়াবে না, সে কাজটা তারা নিজেরাই করতে পারবে। সে কেবল বিষয়টা শেখাবে, গণিতের রাজ্যে প্রবেশের রাস্তাটা ধরিয়ে দেবে। পিনাকীর কাছে পড়ে ওর অঙ্কের ক্লাস করে বহু ছাত্রছাত্রী কৃতী হয়েছে। বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ মৈত্রীশ ঘটক কোনো এক প্রসঙ্গে লিখেছেন, গণিতে তাঁর যা-কিছু অর্জন, তার মূলে তাঁর স্কুলের মাস্টারমশাই পিনাকী মিত্র।

পিনাকীর চালচলনে একটা 'অস্বাভাবিকতা' ছিল। সবসময়ে অন্যমনস্ক থাকত। হঠাৎ কেউ কোনো কথা বললে বা প্রশ্ন করলে হকচকিয়ে যেত, যেন বুঝতেই পারছে না কে কী বলছে। সাধারণ বুদ্ধির মানুষজন ওকে সৃষ্টিছাড়াই ভাবত হয়তো। একথা সত্যি যে, ওর বিদ্যাবত্তা, কথার ভঙ্গি সবই গড়পড়তা

ব্যক্তিমানুষের ধারাবহির্ভূত। সংস্কৃত, গ্রিক, লাতিন আর আরবি ভাষায় বিচরণ করত অনায়াসে। অথচ কতজন জানত তা? জানতই না কেউ। তার কারণ এসব নিয়ে একটি লাইন লেখেনি কখনো। প্রায়ই বলত আমিই ওর একমাত্র শ্রোতা। সেই আমিও বহু চেষ্টা করেছি ওকে দিয়ে লেখাতে। পারিনি। কাজেই নিজের গণ্ডির বাইরে সম্পূর্ণ অচেনা থেকে গেছে পিনাকী, এ ক্ষতি হয়তো পিনাকীর তত নয়, ক্ষতি বাঙালি পাঠকের, ক্ষতি আমারও। কেবলই বলত, লিখতে ইচ্ছে করে না, পড়াতেই আনন্দ, পড়াই আনন্দ।

প্রথম জীবনে অঙ্কই ছিল প্রিয়তম বিষয়। পরে, অনেক পরে, দর্শন, ভাষা আর ইতিহাসে মজে যায়। বারট্রান্ড রাসেল আর স্পিনোজার ভক্ত ছিল। ইয়োরোপীয় ও ভারতীয় চিত্রকলা নিয়ে ওর ভাবনার শেষ ছিল না। ভাষা-ভাবনায় আমরা ছিলাম সহাধ্যায়ী। ওর লেখাপড়ায়, ওর চিন্তাভাবনায় আমারও ছিল নিয়মিত যোগদান। তাই বলতেই হয়, এমন সর্বাত্মক বিজ্ঞতা আমি আর তেমন দেখিনি।

যখন কলেজে পড়ি, তখন থেকেই সুবিনয় রায়ের গান শুনছি আমরা, প্রায়ই একসঙ্গে, একমনে, একমতে। আমি অবশ্য তখনও তাঁর কাছে পৌঁছতে পারিনি। প্রথমে তাঁর ছাত্র হই। পরে তাঁর প্রিয় ছাত্র শংকর চট্টোপাধ্যায়ের সাহায্যে তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য পেতে থাকি। আমাদের দুই বন্ধুর মনের আকাশে তখন সুবিনয় রায় রয়েছেন অনেকটা জায়গা জুড়ে। রবীন্দ্রনাথের গানে এভাবেই আমাদের রুচি পেয়ে যায় ভিন্নতা। যে-কোনো শিল্পীর গান আর শুনতে পারি না। বহু অতি জনপ্রিয় শিল্পীর গানকে আর পছন্দ করছি না। রবীন্দ্রসংগীতের একটা বিশেষ ধারার গানই কেবল শুনি। পিনাকীর বড়ো জামাইবাবু ছিলেন শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় আর নীলিমা সেনের বন্ধু তিনি। এসরাজ বাজাতেন চমৎকার। পিনাকীর সংগীতরুচি খানিকটা তিনিও তৈরি করে দিয়েছিলেন।

পাশ্চাত্য সংগীত পিনাকী ভালো বুঝত। এ নিয়ে ওর প্রায়ই কথা হত আবু সয়ীদ আইয়ুবের সঙ্গে। আসলে আইয়ুবের ছেলে পিনাকীর ছাত্র ছিল। সেই সূত্রে আলাপ, ক্রমে ঘনিষ্ঠতা। আইয়ুব-দম্পতী ওকে খুবই পছন্দ করতেন। তবে পিনাকীর মুখে শুনেছি ওঁদের সঙ্গে কথা বেশি হত দর্শন নিয়ে। 'দক্ষিণী' সংগীতশিক্ষায়তনের সঙ্গে পিনাকীর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। সুদেব গুহঠাকুরতা পিনাকীর জামাই। এইভাবে রবীন্দ্রনাথের গান সম্পর্কে পিনাকীর রুচি আর দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়েছিল ভিন্নভাবে, গতানুগতিকতার বাইরে।

আমরা যখন তরুণ, ত্রিশের নীচে বয়েস, তখন শ্যামবাজারের দেশবন্ধু পার্কে ছিল আমাদের নিত্য আনাগোনা। ছুটির দিনে অনেকগুলো সন্ধে আমরা কাটাতাম পার্কের পুবদিকের সুরকির রাস্তার পাশের ঘাসে। কথা বলতাম রবীন্দ্রনাথ, সুকুমার রায়, রাজশেখর বসু, বটুকদা (জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র), সুবিনয় রায়, নীলিমা সেনদের নিয়ে। কখনো রাজেশ্বরী দত্ত আর মালতী ঘোষাল। এক সময় প্রমথ চৌধুরির গল্পসংগ্রহে বেশ মশগুল ছিলাম আমরা। সেই সংকলনের একটি গল্প প্রায়ই উঠে আসত আমাদের কথালাপে। সেই গৃহশিক্ষকের কথা যিনি তাঁর ছাত্রীকে পড়াতে গিয়ে একদিন অনুভব করলেন তিনি ছাত্রীটিকে ভালোবেসে ফেলেছেন। আবেগ প্রকাশই করে ফেলেন শেলির কবিতার একটি স্তবক আবৃত্তি করে— One word is too often profaned/For me to profane it/One feeling (Possion?) is too falsely disdained for you (Thee?) to disdain it. হাতের কাছে গোল্ডেন ট্রেজারি বা শেলির কাব্যসমগ্র নেই। পঞ্চাশ বছর আগের পড়া। উদ্ধৃতিতে একটু ভুল হল কি না জানি না। কথা হল, সেই গৃহশিক্ষকের ভাগ্যে কী জুটেছিল? গল্পটি আমাদের ভালোও লেগেছিল, কষ্টও হয়েছিল।

একসময় হিন্দুস্থানি সংগীতের বিখ্যাত গাইয়েরা অল্পসময়ের খেয়াল রেকর্ড করতেন। তার খোঁজ পিনাকীই আমাকে দিয়েছিল। তখন কলকাতার বেতারকেন্দ্র 'বেতারজগৎ' প্রকাশ করত। তাতে খেয়াল গান সম্প্রচারের হদিশ থাকত। আমরা শুনতাম বিনায়করাও পটবর্ধন, নারায়ণরাও ব্যাস, আবদুল করিম খাঁ, রাম মারাঠে প্রভৃতি ওস্তাদের পাঁচ মিনিটের খেয়াল গান। পিনাকীর বিশেষ পছন্দের গাইয়ে ছিলেন ডিভি পালুসকরও।

পিনাকী ছিল স্থিরবুদ্ধির মানুষ। চকিতবুদ্ধি ছিলই না ওর। যে বুদ্ধিতে প্রজ্ঞার আলো জ্বলে, যে বুদ্ধি মানুষের মনের অন্ধকার কোণগুলোতে আলো ফেলে, সেই বুদ্ধির অধিকারী ছিল সে। আমার সৌভাগ্য, এমন এক বন্ধু ছিল আমার জীবন জুড়ে। দিনে-রাতে যে-কোনো সময়ে কথা বলতাম আমরা, শেষ কয়েক বছর অবশ্যই টেলিফোনে। কথা বলতাম নানা প্রসঙ্গে, এবং প্রায়ই যা অপ্রসঙ্গ তা-ও হত আমাদের কথালাপের বিষয়। আমি এমন কোনো বই লিখিনি যার পরিকল্পনা নিয়ে পিনাকীর সঙ্গে কথা বলিনি আগে।

আমি জানতাম, ওর স্ত্রী-কন্যাও জানত। আমিই ওর 'একমাত্র' বন্ধু। সহজসম্পর্কে বাঁধা ছিলাম আমরা। সেই সম্পর্কে স্থূল চাওয়া-পাওয়া ছিল না, আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিল না। তবু পাওয়া হয়েছে বহুকিছু, প্রাপ্তির ঝুলি ভরে গেছে আমার। আমি নির্বান্ধব নই। চারপাশে আমাকে ঘিরে রয়েছে অনেক সুভদ্র বন্ধুজন। এদের মধ্যে আছে এমন কেউ কেউ যারা আমার সংসারযাত্রার সহায়, আছে এমনও কেউ যে হয়তো আমার স্বাস্থ্যসুরক্ষার অভিভাবক। তবু পিনাকীর অভাব আমার জীবনের অপূরণীয় ক্ষতি।

ইগলেটারিয়ান কোয়ালিশন— একটি পিকেটিয়ান স্বপ্ন

অর্ক রাজপণ্ডিত

'সঙ্কোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান, সঙ্কটের কল্পনাতে হয়ো না ম্রিয়মান'। রবীন্দ্রনাথের এই গানটি মনে হয় দিব্যি পছন্দ হয়েছে নরেন্দ্র মোদী, নির্মলা সীতারমণদের। সংকটের কল্পনাতে তাঁরা ম্রিয়মান তো মোটেই হচ্ছেন না বরং সংকটকেই অস্বীকার করছেন সোচ্চারে। পঁয়তাল্লিশ বছরের মধ্যে সর্বাধিক বেকারির হার, ছবছরের মধ্যে জিডিপি বৃদ্ধির সর্বনিম্ন হার, উৎপাদনে ধাক্কা, রপ্তানি তলানিতে এসে ঠেকা কোনো কিছুতেই সংকট দেখতে নারাজ মোদী সীতারমণরা। খোলাখুলি ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী সন্তোষ গাঙ্গোয়ার— কর্মসংস্থানে নাকি সংকটই নেই, বরং যথাযথ যোগ্য প্রার্থী না মেলায় নাকি নিয়োগকর্তারা নিয়োগ করতে পারছেন না!

কেউ মুর্খের স্বর্গে বাস করলে তার ভ্রান্তিবিলাস কাটাবার দায়িত্ব অন্যদের নয়। কিন্তু যদি খোদ কেন্দ্রীয় সরকার সংকট থেকে এমনভাবে মুখ ফিরিয়ে থাকে, তা হলে নির্মম বাস্তবটা তাদের মুখের উপর ছুঁড়ে দিতে ইচ্ছে করে। গাঙ্গোয়ারকে কে বলবে, 'টাইমস অফ ইন্ডিয়া' ২০১৮ সালের ৩১ মার্চ তাদের প্রতিবেদনে জানিয়েছিল এ বছরে ভারতীয় রেলে ৯০ হাজার শূন্যপদে চাকরির জন্য আবেদন জমা পড়েছে ২ কোটি ৮০ লক্ষের বেশি। একই বছরে 'মুম্বাই মিরর' ১৭ এপ্রিল তাদের প্রতিবেদনে জানিয়েছে মুম্বাই পুলিশে ১ হাজার ১৩৭টি পুলিশ কনস্টেবল পদে চাকরির জন্য আবেদনপত্র জমা দিয়েছেন দু লক্ষ তরুণ, তাঁদের মধ্যে ৪২৩ জন ইঞ্জিনিয়ার, ১৬৭ জন এমবিএ, ৫৪৩ জন স্নাতকোত্তর। অথচ পুলিশ কনস্টেবল পদের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা চাওয়া হয়েছিল উচ্চ মাধ্যমিক পাশ! এসবই জানেন মোদী সীতারামণ গাঙ্গোয়াররা। জেনেও তাঁরা সবাই 'ডিনায়াল' মোডে। ঘাতকের অস্বীকার!

মূলস্রোতের মিডিয়া 'স্লামপডাউন' দেখতে শুরু করল যখন গাড়ি শিল্পে লাগল জোরালো ধাক্কা। দেশের জিডিপি'র প্রায় সাত শতাংশ, শিল্প ক্ষেত্রের জিডিপি'র এক চতুর্থাংশ আসে অটোমোবাইল শিল্প থেকে। 'সোস্যাইটি অফ অটোমোবাইল ম্যানুফ্যাকচারার্স', সংক্ষেপে 'সিয়াম' অটোমোবাইল শিল্পে প্রায় তিন কোটি মানুষকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান জোগায়। ইতিমধ্যেই সাড়ে তিন লক্ষের বেশি মানুষ কাজ হারিয়েছেন। সংবাদমাধ্যমগুলি সংকট লিখতে শুরু করল যখন অটোমোবাইল শিল্পের টাইটানরা তাদের উৎপাদন বন্ধ রাখতে শুরু করল। টাটা মোটর্স আগস্ট মাসে জামশেদপুরের ইউনিট বন্ধ রাখে তিন দিন, অশোক লেল্যান্ডের উৎপাদন বন্ধ ছিল নদিন, হিরো মোটোক্রপ তাদের উৎপাদন বন্ধ রাখে চার দিন, জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মিলিয়ে মাহীন্দ্রা অ্যান্ড মাহীন্দ্রা উৎপাদন বন্ধ রাখবে প্রায় চোদ্দ দিন।

সংকট মানবেন না অথচ 'স্টিমুলাস'! প্রথম পর্বে নির্মলা সীতারমণের স্টিমুলাস বড়ো কর্পোরেটদের, বহুজাতিকদের। ফরেন পোর্টফোলিও ইনভেস্টর্সদের আর সারচার্জ দিতে হবে না, খালাস! লাভ করো, লোকসান হলে পালিয়ে যাও, তাতে সরকারের লোকসান ১৪০০ কোটি টাকার বেশি। একই সঙ্গে ব্যাঙ্কগুলিকে ৭০ হাজার কোটি টাকার জোগান যাতে ঋণদান অব্যাহত থাকতে পারে। অথচ যে সহজ সত্যিটা এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে তা হল যে সংকট জোগানের নয়। সংকট হল চাহিদার। মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়াতে পারে সরকারি বিনিয়োগ। কিন্তু এ বিষয়ে একটি কথাও বলেননি সীতারমণ। স্টিমুলাস প্যাকেজের দ্বিতীয় পর্বেও হাঙরদের খয়রাতি। রপ্তানিতে বিপুল কর ছাড়, সরকারের লোকসান ৫০ হাজার কোটি আর প্রোমোটার রিয়েল এস্টেট কারবারিদের টাকা ছড়ানো।

সংকট কি শুধুই আংশিক? শুধুই গাড়ি আর বিস্কুট ময়দা শিল্পে? না কি আরো বড়ো চেহারা নিচ্ছে সংকট? এসবিআই'র মুখ্য অর্থনৈতিক পরামর্শদাতা সৌম্যকান্তি ঘোষ এই বছরের ১৪ আগস্ট প্রকাশিত রিপোর্টে দেখিয়েছেন ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে অর্থনীতিতে ব্যাঙ্ক ঋণের পরিমাণ ছিল ২০.৩ লক্ষ কোটি অথচ এই বিপুল পরিমাণ ঋণ জিডিপি বৃদ্ধি ঘটিয়েছে ৩৬.৫ লক্ষ কোটি। সৌম্যকান্তি ঘোষ বলেছেন খুবই অল্প ফেরত এসেছে জিডিপি'র অঙ্কে। মোদী জমানার প্রথম পাঁচ বছরে দেশের ২৭৬৯টি সংস্থার বিক্রিবাট্টা বৃদ্ধি পেয়েছে

৩৪.৫ শতাংশ কিন্তু লাভের পরিমাণ ৪.১ শতাংশ, মুদ্রাস্ফীতির হারের চেয়েও কম।

বহু বছর আগে মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভের চেয়ারম্যান অ্যালান গ্রিন্সপ্যান বলেছিলেন, পুরুষদের অন্তর্বাস কেনার তথ্য দিয়ে সংকট মাপা যায়— যদি সংকট প্রবল হয় পুরুষের অন্তর্বাস কেনার ক্রয়ক্ষমতাও চলে যায়। মজার হলেও এ তথ্য সত্যিই যে গত এক দশকের বেশি সময়ের মধ্যে আমাদের দেশেও পুরুষদের অন্তর্বাস প্রস্তুতকারী সংস্থার বিক্রির হার সর্বনিম্ন এই সময়েই।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে এই সংকটের ফাঁকেই এসেছে 'ক্যাপিটালিজম ইন টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি' বইয়ের লেখক, খ্যাতনামা ফরাসি অর্থনীতিবিদ টমাস পিকেট্টির নতুন বই 'ক্যাপিটালিজম অ্যান্ড আইডিওলজি'। ২০১৩ সালে প্রকাশিত পিকেট্টির 'ক্যাপিটালিজম ইন টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি' তত্ত্বায়িত করেছিল বৈষম্যের অর্থনীতিকে। নতুন বইটিতে বরং অর্থনীতির চেয়ে জোরালো ভাবে ঠাঁই পেয়েছে রাজনীতির কথা। প্রায় ১২৩২ পাতার নতুন বইটি মাত্র কয়েকদিন আগে ফরাসি ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে, ইংরেজি অনুবাদ হয়ে হাতে আসতে প্রায় সামনের মার্চ।

গার্ডিয়ান, ব্লুমবার্গ পিকেট্টির নতুন বই 'ক্যাপিটালিজম অ্যান্ড আইডিওলজি'র রিভিউতে বলেছে শুধু সংকট আর বৈষম্য নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা নয়, বরং বইটি যেন নিজেই বামপন্থীদের একটি ইস্তাহার। ১৯৫০ থেকে ১৯৮০-র দশক অবধি সময়ে বৈষম্য মোকাবিলায় বন্টনে খানিক সমতার সময়কে পিকেট্টি বলেছেন 'ইগলেটারিয়ান কোয়ালিশন'র সময়, সমতার প্রশ্নে সমমাত্রিক জোটের এগিয়ে থাকার সময়। সোভিয়েতের সাময়িক বিপর্যয়ের পরবর্তী সময় থেকে বৈষম্য ক্রমশ আকাশছোঁয়া হয়েছে। পিকেট্টি লিখেছেন সুপার রিচ মাত্র ১০ শতাংশের হাতেই ক্রমশ কেন্দ্রীভূত হয়েছে দুনিয়ার সব সম্পদ। ক্রমশ পিছু হটেছে শ্রমিক শ্রেণি, নিম্ন মধ্যবিত্তরা। দুনিয়া জোড়া সংকট ও আর্থসামাজিক বৈষম্য নিরসনে বামপন্থীদের ভূমিকা সম্পর্কে পিকেট্টির মূল্যায়ন নিয়ে মতান্তর থাকলেও প্রণিধান যোগ্য। পিকেট্টি লিখেছেন পুঁজিবাদের আগ্রাসনকে বামেরা ঠেকাতে পারত কিন্তু তারা পথভ্রষ্ট। শ্রমিক শ্রেণির প্রতিনিধিত্বের চেয়েও লেফটরা বেছে নিয়েছে শিক্ষিত এলিটদের প্রতিনিধিত্বকে। ফলত রাজনীতির নির্ণায়ক ভূমিকায় ক্রমশ দখলদারি বেড়েছে মধ্য দক্ষিণ, দক্ষিণদের। পিছু হটেছে কোথাও মধ্য বাম কোথাও বামেরা। স্বাভাবিক, কারণ তাদের শ্রেণিভিত্তিক সমর্থনের ভিতে ক্ষয় ধরেছে যে! শিক্ষিত মধ্যবিত্ত এলিট দোদুল্যমান থাকে। যে ভাষ্য তার শ্রেণির স্বার্থ সুরক্ষিত করবে, মধ্যবিত্ত সেই ভাষ্যের পক্ষেই দাঁড়িয়ে যাবে। শ্রমিকশ্রেণির মতো অচঞ্চল শ্রেণিরাজনীতি তার নয়। কাজেই, একটি দোদুল্যমান শ্রেণিকে 'ক্লাসবেস' হিসেবে ধরে যদি রাজনীতির লড়াইতে নামতে হয়, তার সুবিধে আখেরে হবে দক্ষিণপন্থীদেরই। ব্রিটেনে লেবার পার্টি যখন থেকে নিও-লেবার হয়েছে, নিল কিনক বা টোনি ব্লেয়ারদের হাত ধরে যখন থেকে তার রাজনীতির অভিমুখ পুঁজিবাদের দিকে সরতে শুরু করেছে, তার ক্ষয়ও সেই সময় থেকেই। বর্তমানে লেবার পার্টির বিপুল হার এবং বিধ্বস্ত অবস্থার দায় যত না করবিনের, তার থেকেও অনেক বেশি বামপন্থীদের এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত এলিটদের কাঁধে চেপে বৈতরণী পার হবার প্রবণতার মধ্যে নিহিত।

আশার সঙ্গে পিকেট্টি লিখেছেন দুনিয়ায় ফের সমতার প্রশ্নে সমমাত্রিক জোট, তাঁর ভাষায় 'ইগলেটারিয়ান কোয়ালিশন' গড়ে তোলা সম্ভব যদি মতাদর্শের ভিত্তিতে মৌলিক বিপ্লবী পুনর্গঠন করা সম্ভব হয়। পিকেট্টির প্রস্তাবনামা, 'সুপার রিচ'দের উপর কর বসাও। সম্পত্তি কর, সম্পদ কর বাড়াও। সম্পদের পুর্নবণ্টন করো, প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের হাতে অন্তত বছরে এক লাখ কুড়ি হাজার ইউরো দাও (পিকেট্টি মূলত ইউরোপের অবস্থা পর্যালোচনা করেছেন)। সোজা সাপ্টা কথা, বড়োলোকদের সম্পদ ছিনিয়ে গরিবদের মধ্যে বণ্টন করো। পিকেট্টির প্রস্তাব, এই নতুন কর কাঠামো প্রয়োগ হলে প্রতিটি দেশের সরকারই দেশের নাগরিকদের ধনী দেশের মজুরির অন্তত ৬০ শতাংশ তুলে দিতে পারবে। কিন্তু যদি 'সুপার রিচ'রা ট্যাক্স দিতে অস্বীকার করে? পিকেট্টির দাওয়াই হল, তাদের ওপর 'এক্সিট ট্যাক্স' চাপাও এবং দুনিয়া জোড়া একটি ন্যায়ের আইনি কাঠামো গড়ে তোলো যাতে পালিয়ে যাওয়া বহুজাতিকরা অন্য দেশে বাসা বাঁধতে না পারে। 'গ্লোবাল জাস্টিস সিস্টেম'-এর প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হোক। নাগরিকরা বরং পছন্দের রাজনৈতিক দলের জন্য বছরে ৫ ইউরো অনুদান দিক।

পিকেট্টির নতুন বইয়ের দিক নির্দেশ— স্পষ্ট বিকল্প অর্থনীতির কথা বললেই হবে না, প্রয়োজন একটি সুনির্দিষ্ট ইস্তাহারের, কী হবে বিকল্পের অভিমুখ। পিকেট্টির প্রস্তাব বামপন্থীরা গরিব মানুষের অভিমুখী কর কাঠামোর পুনর্গঠনের ইস্যুটিকে একটি রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ দিক, যাতে বড়োলোকদের উপর কর বসিয়ে সেই করের টাকায় গরিবের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ঘটানো যায়।

পিকেট্টি যা বলেছেন তা ইউটোপিয়ান নয়, আদায় করা সম্ভব। বৈষম্যের বিরুদ্ধে সমতার আন্দোলনে সমমাত্রিক জোটের লড়াই বিকল্প হাজির করতে পারে। সকলের জন্য আয়, সকলের জন্য কর্মসংস্থান— পিকেট্টির সেই 'ইগলেটারিয়ান কোয়ালিশন' গড়ে তোলার পক্ষেই লড়াই, সমমাত্রিক সমতার জন্য লড়াই। মোদী অথবা সীতারামণরা মানতে চাইবেন না, শুনবেনও না এমন কথা। যে শ্রেণির স্বার্থ তাঁরা দেখেন সেই শ্রেণির পক্ষে এমন তত্ত্ব বিপজ্জনক। দায়টা তাই বামপন্থীদেরই। গরিব মানুষের স্বার্থরক্ষায় করকাঠামোর আমূল সংস্কারকে একটি জনমুখী আন্দোলনের রূপ দিতে হবে তাঁদেরই।

চিঠির বাক্স

নিছক বিতর্কের জন্য আমার প্রিয় এই পত্রিকায় অপ্রাসঙ্গিক একটি বিষয়ের উপর আলোচনা প্রত্যাশা করছি। তা হল একটি মান্য বাংলা দৈনিকে 'বর্গীয় জ'-এর নীচে ফুটকি দিয়ে ছাপা হচ্ছে। পূর্বে এটা কখনো বাংলা পত্র পত্রিকায় দেখিনি। হিন্দি ভাষায় কোনো কোনো অক্ষরের ক্ষেত্রে উপরে বা নীচে ফুটকি ব্যবহার হচ্ছে অনুস্বার অথবা দন্তন্য-ন বোঝাতে। এর তবু একটা অর্থ আছে, কিন্তু বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে এটা আমার ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না। ইংরেজি/ল্যাটিন/জার্মান ইত্যাদি অভিধানে এই অক্ষরের উপর ফুটকি, ডাবল ফুটকির ব্যবহার দেখেছি। সম্ভবত উচ্চারণ বোঝানোর জন্য। তা বলে বাংলায় 'বর্গীয় জ'-এর নীচে ফুটকি কী কারণে হঠাৎ করে কোনো ব্যাখ্যা ছাড়া একটি মাত্র প্রতিষ্ঠান থেকে ছাপা হচ্ছে। আমার আবেদন মাননীয় মাস্টারমশাই / অধ্যাপক / সুধীজন যদি আলোকপাত করতে পারেন তা হলে শুদ্ধ বাংলা লিখতে পারব। পরন্তু আমি এটাও জানতে চাইব এই ফুটকি সূত্র বাংলা ভাষার কোনো সারস্বত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মান্যতা প্রাপ্ত কি না। আমি এই বিষয়ে জানতে চেয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে চিঠি দিয়েছিলাম, কিন্তু তাঁরা আমার এই আবেদনকে মান্যতা দেননি। তাই এই বিষয়ে একটা আলোচনার পরিসর বাংলা ভাষার স্বার্থে *আরেক রকম* পত্রিকার পাতায় হলে ক্ষতি কী এবং বিষয়ের রহস্যতা এই ব্রাত্যজনের জানা সম্ভব হত।

পূর্বের একটি সংখ্যায় শুভনীল চৌধুরী লিখিত পিতৃতর্পণ রচনাটি আমার মনকে ভীষণ নাড়া দিয়েছে। কারণ শুভনীলের বাবার মতো আমাদের বাবাও এদেশে এসে কঠিন পরিস্থিতিতে আমাদের সংসার পরিচালনা করেছেন। সে এক আলাদা ইতিহাস বস্তুত আমরা সবাই একই সূত্রে গাঁথিয়াছি সহস্রটি প্রাণ।

'অক্ষয়বটের দেশ' কলামে কালীকৃষ্ণ গুহ লিখিত বঙ্কিমচন্দ্র, অরুণ সোম, অজয় রায় ও অর্ধেন্দু সেনের নিবন্ধগুলি এবং অমিতাভ রায় রচিত ''নতুন 'নতুন দিল্লি' '' ইত্যাদি রচনাগুলি সুখপাঠ্য।

উপাসক কর্মকার, বিরাটি

২

প্রবন্ধভুক মানুষ আমি। প্রবন্ধের খিদেয় এ-দিক সে-দিক হাতড়ে বেড়াই। যা দিনকাল প্রবন্ধের বড়ো আকাল। ভাগ্যিস শ্রদ্ধেয় ড. অশোক মিত্র 'আরেক রকম' নামাঙ্কিত আমাদের জন্য সুস্বাদু প্রবন্ধের ভাণ্ডার রেখে গিয়েছেন, আমরা বেঁচেবর্তে আছি। এই উন্নতমানের ভাণ্ডারটির মধ্যে আমার প্রিয় মানসিক আহার্য 'অক্ষয়বটের দেশ' যার অপেক্ষায় সতৃষ্ণকাল কাটাই। আমার এই কাঙ্ক্ষিত খাদ্যটি আজকাল নিয়মিত পাই না। অভুক্ত থাকি। মাঝে মাঝে পেয়ে যাই। চেটেপুটে রসনার তৃপ্তি মিটাই। আমার এই সুতৃপ্তির হালুইকর শ্রদ্ধেয় কবি কালীকৃষ্ণ গুহ আমার মনের মানুষ। তাঁর সঙ্গে আমার রাগসংগীতের সুরবাঁধা সঙ্গতে অবশ্যই সুস্বচ্ছ কাব্যধারা। এ-কথা তো ঠিক, কবিরাই সুরেলা গদ্যরচনার মহান কারিগর। কালীকৃষ্ণ-বাবুর গদ্যে সেই সুরেলা সুঘ্রাণ পাই। রাগাশ্রয়ী সংগীতের মতো কড়ি ও কোমলে বাঁধা। শুধু আবেগতাড়িত বিহ্বলতা নয়, বৌদ্ধিক প্রাখর্যে সুমধুর বঙ্কিমী মূর্ছনা।

'আরেক রকম'-এর অষ্টম বর্ষের তৃতীয় সংখ্যায় 'অক্ষয়বটের দেশ'-এর 'না লেখকদের কথা'-য় বৌদ্ধিক মায়াকোমল স্পর্শ। 'না-লেখকদের কথা'-য় 'born to blush unseen'-দের জন্য ওঁর মানবিক কলমাশ্রু আমাদের তন্দ্রাচ্ছন্ন হৃদয়-দুয়ারে কড়া নাড়ে। আমরা জেগে উঠি।

এর আগের সংখ্যায় অক্ষয়বটে বঙ্কিমের সাহিত্য নিয়ে লেখাটিও চমৎকৃত করেছিল।

দীপক কর, পশ্চিম মেদিনীপুর

এখানে উপাসক কর্মকারের চিঠিতে তোলা প্রশ্নটির উত্তর— জ-এর নীচে ফুটকি কেন দেওয়া হচ্ছে আজকাল— তা সহজেই অনুধাবনযোগ্য। কিছু বিদেশি শব্দের উচ্চারণ 'জ'-দিয়ে ঠিক হয় না, যেমন pledge, garage ইত্যাদি। তবু যদি ভাষাচর্চাকারীদের কেউ এ-বিষয়ে মতামত জানান, বাধিত হব।

—সম্পাদক

পুনঃপাঠ

অভিনয় শিক্ষা

ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

এইবার অভিনয় শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের যাহা কিছু বক্তব্য আছে তাহা বলিতেছি।

আমাদের দেশে নাট্যশালায় কীভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা শিক্ষিতের কার্যকলাপ দেখিয়া বিচার করিবার উপায় নাই। আমাদের দেশে অভিনয়বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য কোনও নাট্যশালার সংস্রবে বিদ্যালয়বৎ কোনও অনুষ্ঠান নাই বা 'লেকচার' দিয়া কোনও কিছু শিখাইবার ব্যবস্থা নাই। অভিনেতা হইতে হইলে, প্রথমে শিক্ষণীয় বিষয়াদি কী, তাহা সাধারণভাবে অর্থাৎ এ বিদ্যার বর্ণপরিচয় হিসাবে শিখাইবার কোনও ব্যবস্থা নাই। অভিনয় উদ্দেশ্যে কোনও পুস্তক বিশেষ যখন কোনও নাট্যশালায় মহলা দেওয়া হইতে থাকে, তখনই যাহাদের ভাগ্যে যে যে ভূমিকা শিখিবার ভার পড়ে, সেই সেই ব্যক্তিকে তদগত বিষয়ের প্রয়োজন অনুসারে, যতটুকু কলা-কৌশল শিখাইবার আবশ্যক, ততটুকু শেখানো হয়। অপর সকলকে উপস্থিত মাত্র থাকিয়া দেখিতে শুনিতে হয়। এই প্রথায় আজকাল যাহা ফল হইতেছে, আমাদের বিবেচনায়, তাহা আদৌ শিক্ষা নামেরই যোগ্য নহে। অর্দ্ধেন্দুবাবুর শিক্ষায় এবং গিরিশবাবুর শিক্ষায় শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, মহেন্দ্রলাল বসু, মতিলাল সুর, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির ন্যায় স্বনামখ্যাত অভিনেতৃগণ উৎপন্ন হইয়াছিলেন, কিন্তু ওই সকল অভিনেতার পর শিক্ষাদান কার্যের ব্যবস্থা পরিবর্তিত হওয়ায়, গত বিশ-বাইশ বৎসরের মধ্যে যাঁহারা অভিনেতা বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা অভিনয় বিদ্যার মূলসূত্রগুলি কিছুই ধরিতে পারেন নাই এবং শিখিতেও পারেন নাই। এরূপ অভিনেতার মধ্যে অনেকে আজকাল বয়সে প্রবীণতালাভ করিয়াছেন, অভিনয়ে সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন, নব্যদলের নিকট আদর্শ বলিয়াও গণ্য হইয়াছেন; কিন্তু তবু আমরা বলিব, তাঁহাদের অনেকেই অভিনয় বিদ্যার মূলসূত্রগুলি শিখিবার সুযোগ পান নাই এবং আজিও জানেন না।

সাবেক ন্যাশানাল থিয়েটার ও বেঙ্গল থিয়েটারের প্রতিযোগিতায় অভিনেতৃবর্গের উন্নতির প্রতি দৃষ্টি ছিল। তখনকার শিক্ষকেরা স্ব স্ব শিষ্যবৃন্দকে প্রকৃষ্টরূপে শিক্ষা দিয়া তাঁহাদের সাহচর্যে জয়লাভ করিতে চেষ্টা পাইতেন কিন্তু যেদিন হইতে স্টার থিয়েটার জন্ম গ্রহণ করিল, ন্যাশানাল থিয়েটার মারা গেল; স্টারে ও বেঙ্গলে প্রতিযোগিতা দাঁড়াইল, সেই দিন হইতে বঙ্গীয় নাট্যশালাদ্বার একটি সুকুমার কলা-বিদ্যার উন্নতি ও পুষ্টির দিক হইতে অধ্যক্ষগণের দৃষ্টি বিচ্যুত হইল এবং নাট্যশালাকে কেবল আনন্দপ্রদ, অর্থকর ব্যবসায়ের দিকে পরিবর্তিত করিবার চেষ্টা হইতে আরম্ভ হইল। এই সময় অর্দ্ধেন্দুবাবু কলিকাতায় থাকিতেন না, এক গিরিশবাবু নাট্য-বিদ্যার শ্রেষ্ঠ শিক্ষকরূপে অবস্থান করিয়া স্টার থিয়েটারের অভিনেতৃদলকে এক নতুন প্রথায় শিক্ষিত করিয়া তুলিতে লাগিলেন। গিরিশবাবু দ্বারা ওই সময় যে নবীন শিক্ষা প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহারই গুণে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মিত্র,[১] শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি স্টারের বর্তমান প্রবীণ অভিনেতৃগণের উদ্ভব হইল। ওই প্রণালীর শিক্ষাতেই শিক্ষিত হইয়া উত্তরকালে মিনার্ভা থিয়েটার হইতে শ্রীযুক্ত চুনীলাল দেব, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু), শ্রীযুক্ত নিখিলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, শ্রীযুক্ত নীলমণি ঘোষ, শ্রীযুক্ত অনুকূল বটব্যাল প্রভৃতি অভিনেতৃবর্গের উদ্ভব হইয়াছে। এই সময় শহরের নানা স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নাট্য সম্প্রদায় স্থাপিত হইতে থাকে এবং সেই সকল সম্প্রদায়, উপযুক্ত অভিজ্ঞ শিক্ষার অভাবে গিরিশবাবুর প্রতিষ্ঠিত এই নবীন শিক্ষা প্রণালী অবলম্বন করিয়া অনেকগুলি নাট্যামোদী যুবক অভিনেতার দল বর্ধিত করে। এই সকল অভিনেতার মধ্যে মিনার্ভা থিয়েটারের বর্তমান অভিনেতা শ্রীমণীন্দ্রনাথ মণ্ডল (মন্টুবাবু) শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীকুঞ্জবিহারী চট্টোপাধ্যায়, শ্রীতারকনাথ পালিত, ক্লাসিক থিয়েটারের শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীঅতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য,

শ্রীমনমোহন গোস্বামী বিএ, শ্রীগোষ্ঠবিহারী চক্রবর্তী, শ্রীহীরালাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅহীন্দ্রনাথ দে প্রভৃতির নাম করা যায়।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি, গিরিশবাবু প্রতিষ্ঠিত নবীন শিক্ষাপ্রণালী বঙ্গীয় নাট্যশালাকে কেবল অর্থকর ব্যবসায়ের পদবিতে আরোহণ করাইবার বিশেষ উপযোগী হইয়া উঠিয়াছিল, কাজেই ইহার প্রতি নাট্যসম্প্রদায়ের অধিকারীরা স্বার্থবশে আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। ক্রমে স্টার, এমারেল্ড, মিনার্ভা থিয়েটার স্থাপনের সময় শ্রীযুক্ত অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি আবার আসিয়া শিক্ষাভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন স্টার থিয়েটারের দ্বাদশ বর্ষব্যাপিনী চেষ্টায় নাট্যশালা হইতে পুরাতন শিক্ষাপ্রণালীর ভাব এক প্রকার উন্মূলিত হইয়া গিয়াছিল, কাজেই অর্ধেন্দুবাবু শিক্ষার ভার লইলেও একবারে পুরাতন প্রথার পুনঃপ্রবর্তন করিবার অবসর পাইলেন না। এমারেল্ড থিয়েটারের প্রথম অভিনীত পুস্তক 'পাণ্ডব-নির্বাসন' একা অর্ধেন্দুবাবুর শিক্ষায় পুরাতন প্রণালীতে শিক্ষিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ইহলোকে নাই, কেবল কোহিনুরে সঙ্গীতাচার্য শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ ও ন্যাশানালে শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস চট্টোপাধ্যায় আছেন। দর্শকেরা লক্ষ করিবেন, ইঁহাদের অভিনয় প্রণালীই অপর সকল ব্যক্তি হইতে স্বতন্ত্র এবং কত সহজ, কত সুন্দর ও কত মনোরম! তৎপরে একমাস পরেই গিরিশবাবু আসিয়া এমারেল্ডে অধ্যক্ষপদে অধিষ্ঠিত হওয়াতে তাঁহার 'পূর্ণচন্দ্র' নাটকের শিক্ষা আরম্ভ হয়। তিনি তাঁহার স্টার থিয়েটারক্ষেত্রে দ্বাদশবর্ষের সুপরীক্ষিত নতুন শিক্ষাপ্রণালী এমারেল্ডেও প্রবর্তিত করিলেন। তদবধি অর্ধেন্দু শেখরবাবুর শতচেষ্টার বাধা অতিক্রম করিয়া তাহাই প্রবলবেগে প্রচলিত হইল। গিরিশবাবু এই প্রণালী চালাইবার আর একটি সুযোগ পাইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নিজ রচিত পদ্যছন্দের নাটক। প্রাচীন ন্যাশানাল থিয়েটারের শেষ দশা হইতে অর্থাৎ গিরিশবাবুর অধ্যক্ষতার সূত্রপাত হইতেই গিরিশবাবু গদ্য নাট্যকাব্যের অভিনয় এক প্রকার বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। ছন্দের ঝঙ্কার রাখিতে গিয়া গিরিশবাবু যে সুরপ্রধান, সহজসাধ্য, অভিনয়প্রথা প্রবর্তিত এবং নিজে শিক্ষাদান করিয়া যাহার আদর্শ সকলের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহা এই দ্বাদশবর্ষ পরে অর্ধেন্দুবাবুর একার চেষ্টায় আর পরিশোধিত হইল না। মিনার্ভা থিয়েটারের স্থাপনাবধি গিরিশবাবু ও অর্ধেন্দুবাবু একত্র থাকিলেও গিরিশবাবুর নবীন শিক্ষা প্রণালীতে সংস্কারবদ্ধ অভিনেতৃবর্গকে লইয়া অর্ধেন্দুবাবু এখানেও পুরাতন শিক্ষা প্রণালীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই, কাজেই এখন এই নবীন শিক্ষা প্রণালীরই প্রাধান্য রহিয়াছে। তবে শতবাধার মধ্যেও তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টায় কোনও কোনও অভিনেতাতে বেশ সুফল ফলিয়াছে। দেখা যায় শ্রীযুক্ত তারকনাথ পালিত, শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ পাল, (হাঁদুবাবু) শ্রীযুক্ত কার্তিকচন্দ্র দে প্রভৃতি অভিনেতারা এবং শ্রীমতী তারাসুন্দরী, শ্রীমতী সুশীলাবালা, শ্রীমতী সরোজিনী, শ্রীমতী হেনা, শ্রীমতী প্রকাশমণি, শ্রীমতী ভূষণকুমারী (ছোট), শ্রীমতী চপলা প্রভৃতি অভিনেত্রীরা অর্ধেন্দুবাবুর শিক্ষায় বিশেষ পটুতা লাভ এবং কলাকৌশলের অনেকগুলি সূত্র শিক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত চুনিলাল দেব, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত অটলবিহারী সেন, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল প্রভৃতির অভিনয় প্রথাও অনেকটা পরিবর্তিত হইয়া উঠিয়াছিল। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু), তাঁহার আদিশিক্ষক শ্রীঅমৃতলাল মিত্রের মতো একজন 'আড়ষ্ট' অভিনেতা ছিলেন। স্বীয় পিতা গিরিশবাবুর শিক্ষাতেও তাঁহার এই আড়ষ্ট ভাব ও সর্বত্র করুণ (যেন কান্নার মতো) সুরে অভিনয়ের ঢঙ বদলায় নাই। শুনিয়াছি, তিনি রঙ্গমঞ্চে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অর্ধেন্দুবাবুর নিকট অভিনয় প্রণালীর কোনও উপদেশ লইতেন না; কিন্তু 'সিরাজউদ্দৌলা', 'মীরকাসিম', 'বলিদান' প্রভৃতির অভিনয়ে আমরা তাঁহার বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ করিয়াছি। এই পরিবর্তন অর্ধেন্দুবাবুর শিক্ষায় শিক্ষিত পারিপার্শ্বিক অভিনেতৃবর্গের অভিনয় প্রভাবে ঘটিয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এখন আর আড়ষ্টভাব ও কান্নার সুর ততটা নাই, তবে অস্থানে চিৎকার করা এখনও তিনি ছাড়িতে পারেন না।

আজকাল যে প্রণালীতে নাট্যশিক্ষা দেওয়া হয়, তাহার উদ্ভাবনার ও প্রচারের ইতিহাস আমরা নাট্যশালার বাহিরে থাকিয়া যতটা অনুমান করিতে পারিয়াছি, তাহা এই স্থানে বিবৃত করিলাম। এক্ষণে গিরিশবাবুর এই নতুন প্রথাটি কী এবং তাহার ফল কী দাঁড়াইয়াছে, যথাজ্ঞান তাহার আলোচনা করিব।

এই নবীন শিক্ষায় শিক্ষিত অভিনেতৃবর্গকে আমরা যেভাবে অভিনয় করিতে দেখি, তাহা বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাই যে, ইঁহাদের মধ্যে অনেক অভিনেতারই এই বিদ্যার প্রথম শিক্ষা অর্থাৎ 'বর্ণপরিচয়' পর্যন্ত হয় নাই। এই সকল অভিনেতা নাট্যমঞ্চে দাঁড়াইয়া কথা বলিবার সময় মনে করেন, দর্শকেরাই তাঁহাদের কথোপকথনের পাত্র, সহযোগী অভিনেতারা তাঁহাদের কেহই নহেন। আমরা দেখিতে পাই, তাঁহারা কথা কহিবার সময় দর্শকগণের দিকে চাহিয়া, তাঁহাদের দিকেই হাত-মুখ নাড়িয়া মনোভাব প্রকাশ করেন, আর তাঁহাদের

সহযোগী অভিনেতৃগণ অনাবশ্যক পাত্র পাত্রীর ন্যায় দাঁড়াইয়া তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ মাত্র করেন। 'স্বগত-বাক্য' অভিনয়ের সময়ে এই ব্যাপারটি বিশেষ পরিস্ফুট হইয়া থাকে। অনেকে আবার এতটা বিজ্ঞতা প্রদর্শন করেন যে কথোপকথনের মধ্য কালে কোনও স্বাগত বাক্য বলিবার সময় সহযোগী অভিনেতাকে ছাড়িয়া নাট্যমঞ্চের সম্মুখ-প্রান্তে সরিয়া আসিয়া স্বগতবাক্যের কথাকয়টি দর্শকগণের দিকে চাহিয়া বলিয়া পুনরায় সহযোগীর নিকটে ফিরিয়া যান! এরূপ করাটা যে দোষের, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। অর্দ্ধেন্দুবাবু, গিরিশবাবু, অমৃতবাবু প্রভৃতি শিক্ষকগণও ইহা স্বীকার করিবেন, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই, প্রত্যেক নাট্যশালায় প্রত্যহ আচরিত এই দোষের নিবারণে কেহই যত্ন করেন না। সেদিনকার অভিনীত টাটকা নতুন নাটক 'মীরকাসিম' এবং 'উলুপীর' অভিনয়েও আমরা এই দোষ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আমরা এরূপ বলিতেছি না যে গিরিশবাবুর উদ্ভাবিত নতুন শিক্ষা প্রণালীতে এই দোষ তিনি ইচ্ছা করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন, তবে একথা অবশ্যই বলিব যে, নাট্যমঞ্চে দাঁড়াইয়া অভিনেতা দর্শকগণের অস্তিত্ব ভুলিয়া যাইবেন, দুনিয়া ভুলিয়া যাইবেন, কেবল অভিনেতব্য অবস্থা সম্পূর্ণ রূপে আপনাতে আরোপ করিয়া কথা বলিবেন, সহযোগী অভিনেতার সহিতই আলাপের ভঙ্গিতে কথা কহিবেন, তাহার দিকে চাহিয়াই মুখ চোখের ভঙ্গি দ্বারা বাক্যার্থ প্রকাশে চেষ্টা করিবেন,—অভিনয়ের এই মূলসূত্র, বোধ হয়, এখনকার কোনও অভিনেতাকে শিখাইয়া দেওয়া হয় না বা শিখাইয়া দিলেও তাহারা তাহা হৃদয়ঙ্গম ও তদনুসারে কার্য করিল কিনা, তাহা কেহ লক্ষ করেন না। অভিনেতার নিকট দর্শকগণের অস্তিত্বের এতটুকু পরিজ্ঞাত থাকা আবশ্যক যে, তাঁহারা আছেন আর তাঁহাদিগকে সকল কথা স্পষ্ট করিয়া শুনাইতে হইবে। এই স্পষ্ট করিয়া শুনানোর অর্থ ইহা নহে যে, অভিনেতারা প্রাণপণে সকল কথাই চিৎকার করিয়া উচ্চারণ করিবেন এবং কেবল দর্শকগণকেই সম্বোধনের ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া কথা কহিবেন। এই মূলসূত্র উপদেশ দিতে এবং তাহা শিখাইয়া অভ্যাস করাইয়া দিতে, শিক্ষকের যে যত্ন ও পরিশ্রমের আবশ্যক, আমরা বহুকাল হইতে কোনও নাট্যশালায় কোনও শিক্ষককে তাহা করিতে দেখি না।

অভিনয় বিদ্যার 'বর্ণপরিচয়'—একালের শিক্ষণীয় আর একটি বিষয়ের প্রতি এখনকার অনেক অভিনেতার ঔদাসীন্য দেখা যায়। অনেক অভিনেতাই আজকাল রঙ্গমঞ্চে যাতায়াত করিতে ও দাঁড়াইতে জানেন না। চারি পাঁচজনে আসিতে হইলে, সকলেই সারি গাঁথিয়া আসেন, সারি গাঁথিয়া দাঁড়ান, আবার সারি গাঁথিয়া চলিয়া যান। ইহা এতই বিসদৃশ ও অস্বাভাবিক বোধ হয়, যে এই প্রথার সপক্ষে বলিবার কিছুই নাই; বরং সময়ে সময়ে মনে হয়, ইঁহারা বুঝি কলের পুতুল অথবা বরযাত্রার রেশালার আলোকদণ্ডে দড়ি বাঁধার ন্যায়, ইঁহাদেরও বুঝি কোমরে দড়ি বাঁধা আছে। এইরূপ দল বাঁধিয়া যাতায়াতের প্রয়োজন যদি কোনও নাটকে পুনঃপুনঃ আবশ্যক হয়, তাহা হইলে, আরও বিরক্তিকর হইয়া উঠে। 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে জগৎশেঠ রায়দুর্লভাদির পুনঃপুনঃ আসা-যাওয়ার ব্যাপার এই বিষয়ের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যাঁহারা উহা দেখিয়াছেন, তাঁহারা আমাদের কথা সহজেই বুঝিতে পারিবেন। এই প্রথার সংশোধন করিতে হইলে শিক্ষকগণের বিশেষ যত্ন লওয়া আবশ্যক। গিরিশবাবুর নতুন শিক্ষাপ্রণালীর প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই দোষগুলির প্রাবল্য হইয়াছে। গিরিশবাবুর নাটকগুলিতে দৃশ্য-সংস্থানের বেশ সুবন্দোবস্ত নাই। তাঁহার সমস্ত নাটকেরই অধিকাংশ দৃশ্য দাঁড়াইয়া অভিনয় করিবার ব্যবস্থা করিয়া, তিনি এই দোষটি এক প্রকার অপরিহার্য করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে সিরাজদ্দৌলার মধ্যে মধ্যে একমাত্র সিংহাসনে উপবেশন ব্যতীত আর কোনও দৃশ্যে কাহারও বসিয়া অভিনয় করিবার সুযোগ নাই, এমন কি, শয়ন-গৃহের দৃশ্যের দরবারে, বৈঠকখানাতেও কেহ বসে না। 'মীরকাসিম' নাটকে বক্সারের শিবির মধ্যেও শাহজাদার বসিবার ব্যবস্থা নাই! রণস্থল, পথ, বনপ্রান্ত, দুর্গদ্বার প্রভৃতি দৃশ্যে বসা যায় না তাহা আমরা জানি; কিন্তু শিবির, কক্ষ, প্রাসাদে রাজসভা, মন্ত্রণাগৃহ, ইত্যাদি দৃশ্যে বসিবার ব্যবস্থা করিলে, এই দোষ যে প্রশমিত হইত না, এমন কথা গিরিশবাবু বলিলেও আমরা গ্রাহ্য করিতে প্রস্তুত নহি। এই সকল দৃশ্যে বসিবার ব্যবস্থা করিলে, পটপরিবর্তনাদির কিছু অসুবিধা হয়, এরূপ কৈফিয়ত আমরা মোটেই গণ্য করিব না। কারণ অপর গ্রন্থকার সে বাধা অতিক্রমের কৌশল না জানিতে পারেন; কিন্তু আবাল্য-নাট্যমঞ্চবিহারী, নাট্যমঞ্চভেদজ্ঞ গ্রন্থকার গিরিশবাবুর গ্রন্থে দৃশ্যযোজনায় সে সকল বিষয়ে কোনও গোলমালের আশঙ্কা আমরা দেখিতে ইচ্ছা করি না। কাজেই গিরিশবাবুর নাটকাদিতে এরূপ দৃশ্যযোজনার জন্য উপবেশনাদির অসুবিধা-জনিত অভিনয়-কলার যে ক্ষতি হইতেছে, তাহা গিরিশবাবুরই একপ্রকার অমনোযোগিতার ফল বলিতে হইবে।

গিরিশবাবুর প্রবর্তিত শিক্ষাপ্রণালীতে আর একটি দোষ আমরা বিশেষভাবে লক্ষ করিয়াছি। পদ্যময় নাটকের অভিনয়েই সে দোষ বেশি চোখে পড়ে। সেটি একঘেয়ে একটানা এক সুরে আবৃত্তি। নব্য অভিনেতৃবৃন্দের অধিকাংশ

ব্যক্তিই এই দোষে দোষী, অর্থ বুঝিয়া বচনীয় বিষয়ের উপযুক্ত স্বরভঙ্গি অনেকেই করেন না। গিরিশবাবু স্বরচিত পদ্যময় নাটকের অভিনয়ে ছন্দের ঝঙ্কার রক্ষার দিকে একটু বেশি দৃষ্টি দেওয়ায় কালে অনুকরণ দোষে তাহাও একটি সংক্রামক দোষে পরিণত হইয়াছে। এই দোষটি এমনই দৃঢ় হইয়া পড়িয়াছে যে, ইহার সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবত অর্থবোধের জন্য যে সকল যতি বা ছেদ লক্ষ করিয়া আবৃত্তি করা আবশ্যক, সে সকলের প্রতি লক্ষ মোটেই করা হয় না। আমরা দেখিয়াছি, অনেক অভিনেতা পাদচ্ছেদ, অর্ধচ্ছেদ এমন কি পূর্ণচ্ছেদের প্রতিও দৃকপাত করেন না। নব্য অভিনেতৃগণের অনেকের কাছে শোনা গিয়াছে, তাঁহারা একটা সুরের প্রবাহ (flow) রক্ষা করাকে বেশি আদর ও প্রাধান্য দিয়া থাকেন। কোনও কোনও বুদ্ধিমান অভিনেতাকে অর্থসঙ্গত ছেদ লক্ষ করিয়া আবৃত্তির প্রভেদ দেখাইয়া ও বিষয়ের ঔচিত্যানৌচিত্যের কথা বলিলে, তাঁহারা অন্য কোনও যুক্তিতর্ক না তুলিয়া বলিয়া থাকেন,— অমুক অভিনেতা এরূপ অভিনয় করিয়া যখন সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তখন ইহাকে দোষের বলিয়া পরিত্যাগ করিলে, আমরাই আদর্শের নিকট পৌঁছিতে পারিব না এবং দর্শকের তৃপ্তিবিধান করিতে পারিব না। এরূপ যুক্তি যে যুক্তিই নহে, তাহা বিবেচক ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করিবেন। এই সকল অভিনেতাদের অভ্যাস এমনই বিপথে চালিত হইয়া পড়িয়াছে যে, ইহাদিগের পক্ষে গদ্যাংশ অভিনয় করা কষ্টকর এবং দর্শকের শ্রবণের পক্ষে আরও হাস্যকর ব্যাপার হইয়া পড়ে। স্টার থিয়েটারে 'সাবিত্রী'র অভিনয়ে এইরূপ হাস্যকর অভিনয় আমরা বিশেষভাবে লক্ষ করিয়াছি।

বর্তমান অভিনয় প্রথায় যে সকল দোষ আছে, তাহার প্রধান চারিটি দোষের কথা আমরা উল্লেখ করিলাম অভিনয় শিক্ষা দিবার দোষেই যে এই সকল দোষ অভিনেতৃ-সমাজে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। শিক্ষাদিবার দোষে অভিনেতৃবৃন্দের আরও অনেক দোষ অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটি ধরিয়া আলোচনা করিবার স্থান ও অবসর আমাদের নাই। যে প্রধান চারিটি দোষের কথা আমরা উল্লেখ করিলাম, যদি কোনও শিক্ষক এগুলির প্রতি অবহিত হইয়া এগুলি সংশোধনে চেষ্টিত হন, অন্যান্য অনেক দোষ তাহা হইলে তাঁহার দৃষ্টিপথে আপনিই পড়িবে এবং এই চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে আপনা-আপনি মার্জিত হইয়া যাইবে।

এখন একটি কথার কৈফিয়ৎ আমাদিগকে দিতে হইবে। আমরা নবীন-শিক্ষা প্রণালীর প্রবর্তন গিরিশবাবুর দ্বারা হইয়াছে বলিয়া এক প্রকারে গিরিশবাবুকে এই সকল দোষের উদ্ভাবক ও পরিপোষক বলিয়া তাঁহার কাছে হয়তো অপরাধী হইয়াছি, কিন্তু এ অপরাধের জন্য আমরা দণ্ডিত হইতে পারি না। আমাদের বিশ্বাস, যখন হইতে এই নবীন অভিনয় প্রথা প্রচলিত হইল, তখন গিরিশবাবুর হাতে নাট্যসমাজ করামলকবৎ ঘুরিতে ফিরিতেছিল। তিনি যদি সে সময় স্বীয় শক্তির সদ্যবহার করিয়া এই সমাজকে সুপথে চালিত করিতে চেষ্টা করিতেন, অর্ধেন্দুবাবুর শিক্ষা-প্রণালীকে বজায় রাখিয়া অভিনেতৃগণকে কেবল সুরে[২] আবৃত্তি শিক্ষা না দিয়া অভিনয় বিদ্যার মূল সূত্রগুলি বুঝিয়া শিক্ষা দিতেন, তাহা হইলে, কখনই এ সকল দোষ নাট্য-সমাজে প্রবেশ করিবার পথ পাইত না। যেভাবে শিক্ষা দিয়া তাঁহারা নিজে থিয়েটারের আদিম অবস্থায় 'সধবার একাদশী' এবং 'লীলাবতী' অভিনয় করাইয়াছিলেন, যেভাবে শিক্ষা দিয়া অর্ধেন্দুবাবু 'নীলদর্পণ', 'বিয়ে পাগলা বুড়ো', 'জামাই-বারিক' প্রভৃতি অভিনয় করাইয়াছিলেন, সে ভাবে শিক্ষা দিবার কৌশল বা ক্ষমতা যে প্রতাপচাঁদ জহুরির অধিকারের ন্যাশানাল থিয়েটারের সময়ে বা স্টার-থিয়েটার স্থাপনের সময় গিরিশবাবু ভুলিয়া গিয়াছিলেন বা তাঁহার পক্ষে অবলম্বন করা অসাধ্য হইয়াছিল, একথা আমরা তো স্বীকার করিবই না এবং এ মোকদ্দমায় জিতিবার ইচ্ছা থাকিলেও গিরিশবাবুও করিবেন না। আরও একটা কথায় আমরা গিরিশবাবুর এই ইচ্ছাকৃত অপরাধের প্রমাণ দিতে পারি— সেটা তাঁহার নিজকৃত অভিনয়। তিনি নিজে নিজে তাঁহার নিজের পুস্তকের অভিনয়ে রাম, মেঘনাদ, দক্ষ, প্রভৃতি সাজিয়া কখনও সুরটানা, একঘেয়ে কমা-ফুলস্টপ-হীন অভিনয় করেন নাই। অথচ তাঁহারই সম্মুখে অপরে বিপরীতভাবে অভিনয় করিয়াছেন, তাহাতে তিনি প্রতিবাদ করেন নাই। প্রতিবাদ করিয়া ফল পান নাই বলিলে, আমাদের কথার একটা জবাব মাত্র হইবে, কিন্তু মীমাংসা হইবে না। তিনিই অধ্যক্ষ, তিনিই নেতা, তিনিই শিক্ষক ছিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলে, যত্ন করিলে, চেষ্টা করিলে, পরিশ্রম করিলে এ সকল নবোদ্ভাবিত দোষের দূরীকরণ যে একেবারে তাঁহার পক্ষে অসাধ্য হইত, তাহা আমরা স্বীকার করিতে বড়ই ক্ষুণ্ণ হইতেছি। গিরিশবাবুর পক্ষে একটা মাত্র প্রবল যুক্তি আছে— সুসঙ্গত অভিনয় শিক্ষা দিতে যেরূপ দীর্ঘ-সময় আবশ্যক, 'সধবার একাদশী', 'লীলাবতী', 'নীল দর্পণা'দির প্রথম শিক্ষায় যে পরিমাণ সময় দেওয়া হইয়াছিল, পরবর্তীকালে কি প্রতাপ জহুরি, কি স্টার থিয়েটারের অধিকারীগণ ব্যবসায়ের দিক হইতে ততটা সময় দিতে হয়তো প্রস্তুত ছিলেন না, কাজেই গিরিশবাবু ইচ্ছা-সত্ত্বেও সময়ের অভাবে সুসঙ্গত শিক্ষা দিয়া উঠিতে পারেন নাই। এই কথাটার জবাব আমাদের ন্যায় বাহিরের লোকের পক্ষে দেওয়া বড়ই কঠিন; কিন্তু আমাদের মনে হয় যদি এ

বিষয়ে গিরিশবাবুর প্রকৃত যত্ন ও লক্ষ থাকিত, তাহা হইলে, অঙ্গুলি বক্র করিয়া ঘৃত বহিষ্করণের উপায়ের ন্যায় কোনও একটা কিছুর ব্যবস্থা করা তাঁহার মতো সর্বেসর্বা ব্যক্তির পক্ষে কোনওক্রমে অসম্ভব ছিল না।

যাক এখন অভিনয় শিক্ষার আর এক দিক আলোচনা করিয়া আমরা এই বিষয়ের উপসংহার করিব।

এখন যে কোনও নাটকের অভিনয় দেখিতে যেখানে যাই না কেন, দেখিতে পাই, অধিকাংশ অভিনেতার নিজ নিজ ভূমিকা ভালো অভ্যস্ত হয় নাই। ইহার কারণ আমাদের বোধ হয়, নাট্য-সম্প্রদায়ের অধিকারীদিগের অর্থলালসা পরিতৃপ্তির দায়ে পড়িয়া ভূমিকাগুলি উপযুক্ত রূপে অভ্যস্ত হইবার পূর্বেই তাঁহাদিগকে অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হইতে হয়। ইহার ফলে, অভিনেতৃগণকে দর্শকগণের বিরক্তিভাজন হইতে হয়। অধিকারীদিগের তাড়াতাড়ি সত্ত্বেও আমরা এ বিষয়ে অভিনেতৃবর্গেরও কর্তব্য কর্মে কতকটা অবহেলার দোষ না দিয়া থাকিতে পারি না। অপ্রস্তুত হইয়া অভিনয় করিতে উপস্থিত হইলে, দর্শক সম্মুখে যে অপদস্থ হইবার আশঙ্কা, যে বিদ্রূপ সহ্য করিবার আশঙ্কা আছে তাহা অধিকারীর নহে, অভিনেতৃবর্গের। অপ্রস্তুত হইয়া অভিনয় করিতে আসিলে অভিনেতাদিগকে যে 'ঘরে পরে কি লাঞ্ছনা' সহিতে হয়, তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। দর্শকেরা টিটকারী দিবেই, আবার বেতনদাতা অধিকারীও সে জন্য মহা গরম হইয়া দু-কথা শুনাইয়া দিবেন। এরূপ স্থলে বিশেষ সাবধান হইয়া পাঠ অভ্যাস করা কর্তব্য। আমরা শুনিয়াছি বিডন স্ট্রিটে কি নতুন কি পুরাতন যে কোনও পুস্তকের অভিনয় করিতে হইলে, যতদিন না বিজ্ঞাপন (Placard) দেওয়া হয়, ততদিন নাকি অভিনেতৃবর্গ পাঠ অভ্যাসে বিশেষ রূপে মনোযোগী হন না। ইহা শুনা কথা, সত্য মিথ্যা জানি না: যদি সত্য হয় তবে ইহা অপেক্ষা অভিনেতৃবর্গের নিন্দার কথা আর কিছু হইতে পারে না। অধিকারীবর্গের অর্থলালসার জন্য তাড়াতাড়ি করা যে একটা কু-অভ্যাস হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা আমরা থিয়েটারের বাহিরে থাকিয়াও বুঝিতে পারি। তাঁহারা মনে করেন, যেমন তেমন শিখাইয়া নতুন বহি খুলিতে পারিলেই, যখন পয়সা আসিবে, তখন বেশি বিলম্ব করিয়া ক্ষতি সহিবার প্রয়োজন কি?— ইহার অপেক্ষা তাঁহাদের বিষম ভুল আর নাই। ভালো শেখা হইলে, অভিনয় যে অধিক দিন স্থায়ী হইবে, দর্শকগণ যে অধিক প্রীত হইবেন; একথা ধ্রুব সত্য। অধিকারীরা মনে করিতে পারেন, প্রবীণ অভিনেতৃবৃন্দকে বেতন দিয়া রাখিয়া ও যদি বিলম্ব করিয়া নতুন নতুন অভিনয় করিতে হয়, তবে আমাদের আর লাভ কি? তাহা হইলে ব্যবসায় চলিবে কেন? এ বিষয়ে একটা কথা তাঁহাদের বিবেচনা করা উচিত। প্রবীণ অভিনেতারাই সকল ভূমিকা অভিনয় করেন না। নবীন অভিনেতাদের ভূমিকা ক্ষুদ্র হইলেও শিখিতে বিলম্ব হয়; এ জন্য অপেক্ষা করা উচিত। প্রবীণ অভিনেতাদেরও শিক্ষণীয় অনেক সূক্ষ্ম বিষয় শিখিতে বিলম্ব হওয়া আশ্চর্যের বিষয় নহে। এ বিলম্ব অধিকারীদের নীরবে সহ্য করিতেই হইবে, নতুবা ক্ষতি তাঁহাদেরই। অর্ধ শিক্ষিত বা অসম্পূর্ণভাবে শিক্ষিত পুস্তকের অভিনয়ে দর্শক তৃপ্ত হন না। কাজেই ক্ষতি নিবারণের জন্য অতি অল্পদিনের মধ্যে আবার নতুন নাটকের অবতারণা করিতে অধিকারীকে ব্যস্ত হইয়া পড়িতে হয়; আবার নতুন বিষয়ে খরচান্ত ও নানা উপদ্রবে পড়িতে হয়; কোনও পুস্তক কীরূপ প্রস্তুত হইল, অভিনয়ের উপযুক্ত হইল কি না, তাহা বুঝিবার জন্য, শিক্ষায় কতদিন গিয়াছে, তাহাই গণিয়া অধিকারীরা কোনও সিদ্ধান্ত করিবার পূর্বে অভিনয় শিক্ষকের কথায় বিশ্বাস করিলে, বেশি ফল পাইবেন। কোন পুস্তক কবে অভিনয়ের উপযোগী হইবে, তাহা স্থির করিবার জন্য একেবারে নির্বাকভাবে অভিনয় শিক্ষকের পরামর্শের অধীন না থাকিলে, তাঁহারাই বিশেষ বিপদগ্রস্ত হইবেন। অভিনয় শিক্ষকের প্রতি এ বিষয়ে বিশ্বাস না থাকিলে এ ব্যবসায় যে কোনও অধিকারীর পক্ষে বিড়ম্বনার ব্যবসায় মাত্র হইবে। এরূপ তাড়াতাড়িতে ভালো পুস্তকও জমিতে পারে না এবং ভালো লেখকও নষ্ট হইয়া যান, নতুন লেখকের তো কথাই নাই। লেখক ও নাটক বাঁচাইয়া কাজ করা নাট্য-ব্যবসায়ীদের প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত। 'অমুকের বহি জমিল না'— একথা একবার রটিলে আর সে লেখককে লইয়া আসরে নামা দায় হইয়া উঠে! অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়, পুরাতন পুস্তকের অভিনয় করিতে হইলেও অধিকারীরা অসম্ভব তাড়াতাড়ি করেন। এমন কি চার-পাঁচ দিনমাত্র শিক্ষা দিয়াই অভিনয়ে প্রবৃত্ত হন। এরূপ স্থলে তাঁহাদের বিবেচনা করা উচিত পুস্তকখানা পুরাতন কাহার নিকট?— অবশ্য তাঁহার অভিনেতৃবর্গের নিকট নহে, দর্শকের নিকট বটে। কোথাও অভিনেতৃবর্গের মধ্যে দু-একজন হয়তো, সেই পুরাতন পুস্তকের পুরাতন অভিনেতা থাকিতে পারেন, কিন্তু আর সকলের পক্ষে তাহা নতুন পুস্তকের অপেক্ষা কোনও অংশে নতুনত্বে হীন নহে; সুতরাং একখানা নতুন পুস্তকের শিক্ষায় যে পরিমাণ সময় আবশ্যক পুরাতন পুস্তকের শিক্ষায় প্রায় ততটাই সময় লাগিবে, ইহাতে অতি মূর্খেরও সন্দেহ করা বা তাড়াতাড়ি করা উচিত নহে। যদি মনে করেন, দর্শকের নিকট যে পুস্তক পুরাতন, সে পুস্তকের শিক্ষার জন্য বেশি অর্থ ও সময় ব্যয় করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া বুদ্ধিমানের কার্য নহে। ইহা

স্বীকার করি, কিন্তু অসম্পূর্ণ শিক্ষায় পুরাতন পুস্তকের অভিনয় করিয়া দর্শকের পক্ষে পূর্ব দৃষ্ট অভিনয়ের তুলনায় বর্তমান অসঙ্গত অভিনয় দেখাইয়া অধিকতর বিরক্তি উৎপাদন করা কোনওক্রমেই নিজের সম্প্রদায়ের সম্ভ্রম রক্ষার পক্ষে অনুকূল নহে। নিজের অর্থ ও সময় ব্যয় করিয়া, জানিয়া শুনিয়া, নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি যাচিয়া দর্শকের অশ্রদ্ধা আনয়ন করা, কোনওক্রমেই সুযুক্তি সঙ্গত বলিয়া আমাদের মনে হয় না।

আরও একটা কথা— যে দিন কোনও নতুন কি পুরাতন নাটকের অভিনয়ের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, সেই দিনই থিয়েটারের অধিকারীরা দর্শকের সহিত ধর্মের চক্ষে (morally) সুসঙ্গত অভিনয় দেখাইতে বাধ্য বলিয়া চুক্তি করেন; সুতরাং কোনও অছিলায় কোনও ওজোর আপত্তিতে দর্শকের বিরক্তি ভাজন হইলে, তাঁহারা ধর্মের দৃষ্টিতে চুক্তিভঙ্গের দোষে পতিত হন। কোনও ভদ্রলোক চুক্তিভঙ্গের দোষ করিলে যে লজ্জাবোধ করেন না, ইহা আমরা থিয়েটার ভিন্ন আর কোথাও দেখিতে পাই না।

অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, অসম্পূর্ণভাবে শিক্ষিত পুস্তকগুলির অভিনয়ে দর্শকেরা যে নিশ্চিতই বিরক্ত হন, তাহা অতি অল্পদিনের মধ্যে দর্শকভঙ্গ দেখিয়াই নাট্যশালায় অধিকারীরা বুঝিতে পারেন। এই জন্যই পুরাতন পুস্তকের অভিনয় নতুন করিয়া করিতে গেলে, আমরা দেখিতে পাই, আজকাল প্রত্যেক নাট্যশালাতেই দু-এক রাত্রির পরই তাহার সহিত আর একখানি অল্পপ্রাণ পুস্তকের অভিনয় জুড়িয়া দেওয়া হয়। আমরা শুনিয়াছি, এরূপ প্রথার জন্য নাট্যশালার কর্তৃপক্ষেরাও মহাবিরক্ত। তাঁহারা বিরক্ত হইয়াই এই প্রথাকে ‘লেজুড় জুড়িয়া দেওয়া’ বলিয়া ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাকেন, অথচ ইহার সংস্কারের কোনও চেষ্টাই করেন না! ইহা তাঁহাদেরই তাড়াতাড়ি করিয়া বহি-খোলা-পাপের প্রতিফল। অনেক সময়ে নাটক ভালো হইলেও যে দর্শক জুটে না তাহার কারণও এই।

এ বিষয়ে আমাদের যাহা বলিবার ছিল, স্থূলত তাহার সকল কথাই বলা হইল। এক্ষণে নাট্যশালার অধিকারীগণ, শিক্ষকগণ, এবং অভিনেতৃগণ এগুলি অনুধাবন করিয়া পরস্পর কর্তব্য-চিন্তা ও সংশোধনের উপায় অবলম্বন করিলে আমরা প্রীত হইব। তাঁহাদের অবিবেচনার দায়ে তাঁহাদের যে ক্ষতি হয়, সে ক্ষতি তাঁহাদের ন্যায্য প্রাপ্য; কিন্তু তাঁহাদের অবিবেচনায় আমরা দর্শকবৃন্দ পয়সা দিয়া, অভিনয়-দর্শনে বিমল-আনন্দ এবং সৎপ্রবৃত্তির তৃপ্তি উপভোগের প্রলোভনে যে অতৃপ্তি, যে বিরক্তি ও যে অর্থক্ষতি সহিয়া থাকি, তাহার কথা নাট্যশালার কর্তৃপক্ষগণের বিবেচনা করা একান্ত কর্তব্য নহে কি?

---

১. এই প্রবন্ধ প্রকাশের সময় এই দুই অভিনেতাও জীবিত ছিলেন। কিন্তু আজ আর নাই।

২. অর্চনা পত্রিকায় ১৩১৬ সালের আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র সংখ্যায় গিরিশবাবু নিজে প্রবন্ধ লিখিয়া এই সুরে অভিনয় প্রথা সম্বন্ধে প্রতিবাদ করিয়াছেন।

(বানান অপরিবর্তিত)

ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায় প্রণীত *বঙ্গীয় নাট্যশালা* গ্রন্থটির ১৩১৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত দ্বিতীয় প্রবন্ধ *অভিনয় শিক্ষা* এখানে পুনঃপাঠে রাখা হল। ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১২৭৫ বঙ্গাব্দে। বস্তুত এটি তাঁর ছদ্মনাম। আসল নাম ব্যোমকেশ মুস্তাফি। ইনি সেকালের বিখ্যাত অভিনেতা ও নাট্যশিক্ষক অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফির পুত্র। ব্যোমকেশ নিজের নামেও অজস্র প্রবন্ধ লিখে বিখ্যাত হয়েছিলেন। মনে করা হয় তিনি তাঁর পিতার পক্ষ নিয়ে গিরিশচন্দ্র ঘোষের কিছু সমালোচনা করেছিলেন বলেই ছদ্মনাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর লেখা নিঃসন্দেহে অতি মূল্যবান। মাত্র সাতচল্লিশ বছর বয়সে, ১৩২২ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

বইটির বর্তমান সংস্করণটি বিষ্ণু বসু কর্তৃক সম্পাদিত ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নাট্য আকাদেমি কর্তৃক প্রকাশিত।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায় যেসব নাটকের আলোচনা করেছিলেন সেগুলির অভিনয় হয়েছিল ১৮৭৪ থেকে ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। আরো উল্লেখনীয় যে ১২৩৮ বঙ্গাব্দে কলকাতার শ্যামবাজারে নবীনচন্দ্র বসুর বাড়িতে *বিদ্যাসুন্দর* অভিনীত হবার আগে কোনো নাট্যাভিনয় হয়েছিল বলে নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় না। ১২৬৪ সালে রামনারায়ণ তর্করত্নের *কুলীন-কুল-সর্বস্ব* নাটকের অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে বাঙালির নাট্যসাহিত্যের ও নাট্যাভিনয়ের অভ্যুদয় ঘটে। আর ১২৭৯ বঙ্গাব্দে *ন্যাশনাল থিয়েটার*-এর প্রতিষ্ঠার দিন থেকে বঙ্গীয় নাট্যশালার প্রকৃত প্রতিষ্ঠা ঘটে।

—সম্পাদক

ছবি : দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

Social Scientist

সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্র নিয়ে তথ্যনির্ভর চিন্তাশীল প্রবন্ধসমষ্টি। বছরে ছ'টি সংখ্যা। কয়েক দশক ধরে প্রকাশিত হচ্ছে।

চাঁদার হার

এক বছর : ৩০০ টাকা

দুই বছর : ৫০০ টাকা

তিন বছর : ৬০০ টাকা

সম্পাদক

প্রভাত পট্টনায়ক

সম্পাদকমণ্ডলী

মধু প্রসাদ | উৎসা পট্টনায়ক | বি. রঘুনন্দন

সি. পি. চন্দ্রশেখর | জয়তী ঘোষ | বিশ্বময় পতি

সম্পাদকীয় দপ্তর

৩৫এ/১ শাহপুর জাট

নতুন দিল্লি ১১০০৪৯

Issue date 16 February 2020. Registered No. KOL RMS/455/2019-2021
Registered with the RNI NO. WBBEN/2013/49896.
Vol. 8, Issue 4 Arek Rakam

mio
amore™
THE CAKE SHOP

Published by Trishitananda Roy on behalf of Samaj Charcha Trust from 3rd Floor, 39A/1A, Bosepukur Road, Kolkata–700 042 and printed by him at S. P. Communications Pvt. Ltd., 31B Raja Dinendra Street, Kolkata–700 009.

Rs. 30